মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-১, সংখ্যা-১২

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

জানুয়ারী ২০১৩ইং, সফর ১৪৩৪হি:

صفر المظفر ١٤٣٤ه يناير ٢٠١٣م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাওঃ নাসির উদ্দীন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮

ই-মেইল: monthlyalabrar@gmail.com

ওয়েব : http://monthlyalabrar.com

http://monthlyalabrar.wordpress.com/

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে ৫

পবিত্র সুন্নাহ থেকে ৬

দরসে ফিক্হ ৭
মুফতী শাহেদ রহমানী

হযরত হারদূয়ী (রহ.) এর অমূল্য বাণী ১০

মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত ১১

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৬ .... ১৩
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

শেয়ার বাজার-৪.. ১৮
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী

কোয়ান্টাম মেথড-৯.................................... ২০
মুফতী শরীফুল আজম

যা রেখে গেলেন মুফতী আমীনী (রহ.) ২৫
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী প্রসঙ্গে কিছু কথা ২৯
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

'থার্টি ফাস্ট নাইট' ঈমান ধ্বংসের মহা উৎসব....... ৩২
মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৪

নবীজী (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৩ ৩৯
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

উদীয়মান কাফেলা.................................... ৪৪

তারানা.. ৪৫

খবরাখবর.. ৪৬

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক:০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮১২৩৫৭৫২২

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯ সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৮৩১৭৪০৫৪০

সম্পাদকীয়

সফল হোক তাবলীগী বিশ্ব ইজতিমা

প্রতি বছরই উত্তর ঢাকার ঐতিহাসিক তুরাগ তীরে টঙ্গির সুবিশাল ময়দানে তাবলীগ জামা'আতের বিশ্ব ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দুনিয়ার বহু দেশের হাজারো দাওয়াতী কাফেলা এই ইজতিমায় অংশ নিয়ে থাকেন। দলমত নির্বিশেষে এদেশের লাখ লাখ মুসলমান বিশ্ব ইজতিমায় এসে দাওয়াতী ফিকির, যিকির এবং বিভিন্ন ইবাদত ও মুনাজাতে মশগুল হন মহাসমারোহে। নিজের জান, মাল এবং সময় ব্যয় করে প্রত্যেকে আপন আপন উদ্যোগে একমাত্র হিদায়াত প্রাপ্তি এবং দুনিয়া ব্যাপী হিদায়াত প্রসারিত হওয়ার মহত নিয়্যতে মেহনতকারী মুসলমানদের এটি সর্ববৃহত নূরানী ইজতিমা।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মুসলমানদের এই মুজাহাদা ও মেহনত চালু রয়েছে। এই মেহনতের মাধ্যমে মুসলমানদের ঘরে ঘরে যেমন ঈমানের আলো পৌঁছে যাচ্ছে তেমনি অমুসলিমরাও ইসলামের স্বার্থকতা ও সুনিপূন আদর্শ দেখে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে তাবলীগ জামা'আতের ইজতিমাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বড় রহমত সকল ইজতিমার মূল নির্যাস বিশ্ব ইজতিমাটি বাংলাদেশের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সারা দুনিয়া থেকে মুসলমানগণ দাওয়াতী ফিকির নিয়ে বাংলাদেশেই অতিথি হয়ে আসেন। আর বাংলাদেশের মুসলমানগণ মেজবান এর ভূমিকায় দূর দেশ থেকে আসা এসকল মেহমানদের মেহমানদারীর সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে এদেশের মুসলমানদের চেতনা আরো জেগে উঠুক এই কামনা সবার।

পথভ্রষ্ট মানবজাতিকে পথের দিশা দিতে যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত এক লাখ মতান্তরে দুই লাখ ২৪ হাজার নবী ও রাসূল দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা সবাই নিজ দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পালন করে গেছেন। হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমন ও ওফাতের মাধ্যমে এ ধারার সমাপ্তি ঘটে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পর থেকে এ দায়িত্ব খোলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবায়েকেরাম, তাবেইন, তাবেতাবেইন, সলফে সালেহিন এবং আলেম-ওলামা ও পীর মাশায়েখগণ অদ্যাবধি পালন করে আসছেন। ১৯২৬ সালে দিল্লির মেওয়াতে দারুল উলূম দেওবন্দের একজন কৃতিসন্তান মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন, যার সম্প্রসারিত রূপ আজকের টঙ্গির তুরাগ তীরের বিশ্ব ইজতেমা। মানুষের মুক্তি ও কামিয়াবী হাসিলের উদ্দেশ্যে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখাই এ দাওয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা এ দাওয়াতি কাজটির দায়িত্ব ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত- সবার ওপর সমানভাবে ন্যস্ত করেছেন। সে কারণে প্রত্যেকের ওপরই তার স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যের প্রচার-প্রসার করা অত্যাবশ্যক। বিদায় হজের ভাষণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। অতএব আমার একটি বাণী হলেও অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।'

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আমি চাই তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক, যারা মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আহ্বান করবে, আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। ওই দলটাই হলো সফলকাম।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৪)।

পথভোলা মানুষকে পথের সন্ধান দেওয়া, বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথে আনা, মানুষকে সুপরামর্শ দেওয়া, চরিত্রবান ও সৎ সাহসী করা, অভাবগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, দুস্থ, এতিম, অসহায়ের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করা, মহৎ কর্মের উপমা সৃষ্টি করা, ভালো কাজে উৎসাহিত করা, মন্দ থেকে বিরত থাকার আবেগ সৃষ্টি করা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া, এক কথায় ইহকাল ও পরকালের শান্তির জন্য মানুষকে সত্য ও সরল পথে চলার আহ্বানই হচ্ছে দাওয়াত বা তাবলীগ।

মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হলে, ভালো দিয়ে মন্দের মোকাবেলা করতে হলে বিনয়ী ও ধৈর্যশীল হতে হবে। মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষের মর্যাদা বুঝতে হবে। হৃদয়ে মানুষের প্রতি ভালোবাসা পয়দা না হলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা সম্ভব নয়। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'তোমরা মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করো, রূঢ় আচরণ করোনা, সুসংবাদ দাও, ভীত সন্ত্রস্ত করোনা।' (বুখারি ও মুসলিম)। আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, 'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাকো হিকমত বা কৌশল সহকারে ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে এবং বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়।' (সূরা নাহল, আয়াত-১২৫)।

দাওয়াত ও তাবলীগে সময়, জান ও মাল উৎসর্গ করে আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক হতে হবে। সাধনা করে নিজের কথা ও কাজে রূহানি প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে। তবেই মানুষ আহ্বানে সাড়া দেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–'হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে কি এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দান করব, যা তোমাদেরকে কঠোর আজাব থেকে রক্ষা করবে? তা হলো, তোমরা আল্লাহর ওপর ও আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে, মেহনত করবে আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জান দিয়ে।' (সূরা আস-সাফ, আয়াত-১০)। হাদীস শরীফে আছে 'আল্লাহর রাস্তায় একটা সকাল বা একটা বিকেল ব্যয় করা সারা দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।' আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে মেহনত করার অর্থই হচ্ছে সৃষ্টিকে ভালোবেসে স্রষ্টার ইবাদতে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। এই পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে মানুষের স্থায়ী (পরকালীন) মুক্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং পার্থিব কল্যাণ

করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তার কথার চেয়ে উত্তম কথা কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং সে বলে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত-৩৩)।

কুরআন-হাদীসের দাবি পূরণ এবং নবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পীর মাশায়েখ, ইমাম, মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের এই আদর্শ বাস্তবায়নে হজরত মাওলানা ইলিয়াস রহ: ১৩৪৫হি. মোতাবেক ১৯২৬ইং সালে ভারতের এক জনবিরল অঞ্চল মেওয়াত থেকে হাতেগোনা ক'জন মানুষ নিয়ে তাবলীগী দাওয়াতের মেহনত শুরু করেন। তাবলীগের এ মেহনতই এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৩৫৬হি. মোতাবেক ১৯৩৭ইং সালে হযরত ইলিয়াস (রহ.) দাওয়াতের কাজে জড়িত মেওয়াতবাসীকে জামা'আতবদ্ধ করে অন্যান্য শহরে পাঠাতে আরম্ভ করেন। ১৩৬০ হি. মোতাবেক ১৯৪১ সালে মেওয়াতের নূহ অঞ্চলে (যেখান থেকে তাবলীগের কাজ আরম্ভ হয়) এক বিশাল ইজতিমার আয়োজন করেন। এটি ছিল তৎকালীন তাবলীগ জমা'আতের সর্ববৃহত প্রথম ইজতিমা। (দারুল উলূম দেওবন্দ এহয়ায়ে ইসলাম কি আজীম তাহরীক ৪৪৫-৪৪৬)

হজরত মাওলানা আবদুল আজিজ (রহ.)-এর মাধ্যমে ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশে তাবলীগ জামা'আতের কাজ শুরু হয়। তারপর ১৯৪৬ সালে বিশ্ব ইজতেমা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের তাবলীগের মারকাজ কাকরাইল মসজিদে। পরে ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম হাজী ক্যাম্পে ইজতেমা শুরু হয়। এরপর ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে, তারপর ১৯৬৫ সালে টঙ্গির পাগারে এবং সর্বশেষ ১৯৬৬ সালে টঙ্গির ভবেরপাড় তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়। সেই থেকে এ পর্যন্ত সেখানেই ১৬০ একর জায়গায় তাবলীগের সর্ববৃহৎ ইজতেমা বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বিশ্বব্যাপী তাবলীগের এই কাজ মূলত দারুল উলূম দেওবন্দের সুদূরপ্রসারী দ্বীনি মিশনের একটি অংশ। দারুল উলূম দেওবন্দ তিনটি বস্তুর সমন্বয়ের নাম। সঠিক দ্বীনি শিক্ষা, নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক দীক্ষা এবং সঠিক পন্থায় দ্বীনি দাওয়াত। এই তিনটি বিষয়েই দারুল উলূম দেওবন্দের খেদমাত আজ সারা দুনিয়ায় প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। খাটি ইসলামী শিক্ষার ধারা যেমন সারা পৃথিবীতে কওমী মাদরাসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তেমনি নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক শিক্ষার ধারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে খানকাহ ও পীর মাশায়েখদের মাধ্যমে। সেরূপ সারা দুনিয়ায় তাবলীগ জামা'আতের মাধ্যমে দ্বীনি দাওয়াতের কাজ উজ্জীবিত রয়েছে।

এত সল্প সময়ে এই তিন তরীকার কাজে দারুল উলূম দেওবন্দের সফলতা ইসলাম বিরোধী বাতিল শ্রেণীর জন্য নিশ্চয়ই গাত্রদাহের কারণ। যা কারো সহ্য হওয়ার কথা নয়। সে কারণে কওমী ধারার সঠিক ইসলামী শিক্ষাকে স্তব্ধ করার মানসে আবিস্কার করা হয়েছে বিভিন্ন পন্থার নামধারী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা- বিভিন্ন মাদরাসা। তদুপরী কওমী মাদরাসার উপর বিভিন্ন অপবাদ। তেমনি সঠিক রূহানী শিক্ষা থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ভ-পীর, মাজার পূজা ইত্যাদি। অপর দিকে তাবলীগ জামা'আত থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিভিন্ন বাতিল ফিরকা তাবলীগের নামে বিভিন্ন পথ ও পন্থা সৃষ্টি করেছে। যারা হুবহু তাবলীগ জামা'আতের মতই মসজিদে মসজিদে অবস্থান করে। এ পর্যন্ত সেরূপ বহু সংগঠন ও দল সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলো জ্বলে উঠতেই নিভে গেছে। আবার দারুল উলূম দেওবন্দের এই তিন মিশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার প্রোপাগা-া ছড়াতে দেখা যায় মিডিয়া নির্ভর আরো কিছু দল উপদলকে।

সম্প্রতি আরেকটি ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো দারুল উলূম দেওবন্দের এই তিনটি মিশনকে পরস্পর বিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা। তাবলীগ জামাআতে এমন কিছু লোক পরিকল্পিতভাবে প্রবেশ করেছে যারা কওমী মাদরাসার সমালোচনা করে থাকেন। পীর মাশায়েখের তরীকার বিরোধিতা করে থাকেন। আবার তরীকতপন্থীদের অনেকে তাবলীগ জামা'আতের বিরোধিতা করে থাকেন। অথচ যাদের হাতে তাবলীগ জমা'আতের প্রতিষ্ঠা তাঁরা নিজেরাই পীর ছিলেন, রূহানী তরীকার সবক দিতেন, জিকির করাতেন।

১৯৪১ সালে মেওয়াতে অনুষ্ঠিত তাবলীগী ইজতিমায় মুফতীয়ে আজম হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ (রহ.)ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন "এটি ছিল অনন্য ইজতিমা। এটিই ছিল দারুল উলূম দেওবন্দের মূল মিশন ইলম, যিকির, তাবলীগ এর সমন্বিত প্রয়াস।"(সূত্র : প্রাগুক্ত)

এতদ সম্পর্কে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) "হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. ও তাঁর দ্বীনী দাওয়াত পৃ. ১৩০"- তে লেখেন–

হযরত মাওলানার (মাওলানা ইলিয়াস রহ. মেওয়াতে) অবস্থানকালে বিপুল সংখ্যক মেওয়াতি তাঁর হাতে বাইআত হতেন। বায়'আতকালে তিনি তাঁর দাওয়াত পেশ করতেন এবং এ কাজে আত্মনিয়োগ করার ওয়াদাও নিতেন। ...

এই বিষয়ে এদেশের শীর্ষ মরুব্বী ফক্বীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী আব্দুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম) এর একটি মূল্যবান বয়ান মাসিক আল-আবরার ডিসেম্বর ২০১২ইংতে ছাপা হয়েছে। তাতে তিনি বলেন–

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) মদীনা শরীফ থেকে হিন্দুস্তানে চলে আসার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে তাবলীগের কাজ নিলেন। সারা দুনিয়ায় তাবলীগ চলছে। সেই নেজামুদ্দীন মসজিদের ভিতরে বাইরে শেষ রাত্রে জিকিরের আওয়াজে সারা নেজামুদ্দীনের বস্তি কাঁপত। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁরই সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহ.) একই জিকির এবং বায়'আত মুরীদের কাজ করেছিলেন। তাঁর পর হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব (রহ.)। তাঁরা উভয়ের সাথে আমি তাবলীগ করেছি। নেজামুদ্দীনে একই সাথে বায়'আত-মুরীদীও হচ্ছে আবার জিকিরও হচ্ছে। মসজিদের ভিতরে বাইরে জিকিরের হালকা। ...

তিনি আরো বলেন–

"হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এর জিকিরের হালকা কত বড় ছিল! আমি তাও স্বচক্ষে দেখেছি। প্রতিদিন ফজরের

নামাযের পর তাঁর সেখানে জিকির হত। জাকেরীনদের সংখ্যা কখনও ৫০/৬০, কখনও ৮০/৯০/১০০ জন পর্যন্ত হয়ে যেতো। সবাই উচ্চস্বরে করে জিকির করেছেন। হযরত কাউকে বলেননি তোমরা চুপে চুপে যিকির কর। যিকির এরপর চা-নাস্তা সেরে যার যার কাজে যেত।

নেজামুদ্দীনের হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) গাঙ্গুহতে জিকির করতে করতে তো পুরা শরীর একেবারে শুকিয়ে ফেলেছিলেন। হাড্ডি ছাড়া গোশত ছিলনা। সারা রাত জিকিরে যেহেরী করতেন।"

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত আরো বলেন–

"বর্তমানে ইলম আর জিকির চলার সাথে সাথে তাবলীগের সাথেও সম্পর্ক রাখতে হবে। তাবলীগ এর কাজও দেওবন্দিয়্যাতের ৩টি কাজের একটি। ইলম, জিকির, দাওয়াত ও তাবলীগ। ইলম ও জিকির করেন। দাওয়াত ও তাবলীগে না গেলে অসুবিধা নেই, কিন্তু বিরোধিতা করবেন না। কেননা দাওয়াত ও তাবলীগ দেওবন্দিয়তেরই একটি অঙ্গ। আপনি নিজেকে দেওবন্দী দাবী করবেন, আর তাবলীগ এর বিরোধিতা করবেন এটা কেমনে হয়? হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. একদিন তাঁর মজলিসে বলেছিলেন, (যা আমি নিজের কানে শুনেছি।) "ভাই! তোমাদেরকে আমি বলছিনা যে, তোমরা তাবলীগে যাও, এমন তো না যে, তাবলীগ ফরজে আইন। কিন্তু একথা অবশ্যই বলব, তাবলীগের বিরোধিতা করো না। কারণ যদি তুমি বিরোধিতা করো তবে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যাওয়া খাতরার মধ্যে থাকবে।" একথা বলেছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি দেওবন্দী ইলম, দেওবন্দী জিকির, দেওবন্দী তাবলীগ তিনটা নিয়ে চলেছেন পুরো জীবন।

উল্লেখিত ৩টা কাজের নাম হলো দেওবন্দীয়্যাত।"

এসব থেকে প্রতীয়মান হয়, তাবলীগ জামা'আত, কওমী মাদরাসা এবং খানকাহকে আলাদা করে দেখানো এবং পরস্পর বিরোধী বলে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তবে তাবলীগ জামা'আত বা অন্য যেকোনো মিশনের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একবার কেন হাজার বার কথা বলতে পারবেন। কারণ মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ে শরয়ী সমাধান দেবেন ওলামায়েকেরাম। এটি হবে আত্মসংশোধনের শামিল।

মোট কথা হলো কওমী মাদরাসা, সঠিক পন্থার পীর মাশায়েখ ও খানকাহ, তাবলীগ জামা'আত এবং আজকের বিশ্ব ইজতিমা সবই দারুল উলূম দেওবন্দের মুরব্বীদের নিরলস মেহনতেরই ফসল, দারুল উলূম দেওবন্দেরই বিস্তৃতি। এই মিশনের বিরুদ্ধে দুনিয়া ব্যাপী ষড়যন্ত্র চলছে প্রারম্ভকাল থেকেই। আমাদের সকলকে এ মিশনের বিরুদ্ধে বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে সর্বক্ষণ সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। সেটা যেরূপেই আসুক পরস্পর বোঝাপরা ও পরামর্শের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করতে হবে। বিশ্ব ইজতিমা সফল হোক, দারুল উলূম দেওবন্দের এসকল মিশনের মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকুক এই কামনায়...।

প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন শায়খুল হাদীস মুফতী আমিনীর ইন্তিকাল

জাতি হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সঠিক ও সফল প্রতিনিধিত্বকারী এক অভিভাবক হারালো!

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির আমীর, জামিয়া কুরআনিয়া আরবিয়া লালবাগের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস প্রখ্যাত হাদীস ও আইন বিশারদ, দেশবরেণ্য আলেম ও সাবেক সংসদ সদস্য হযরত মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) এর হঠাৎ মৃত্যুতে গভীর শোক ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে "ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা ঢাকার" প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট আইন ও হাদীস বিশারদ হযরতুল আল্লামা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান এক বাণীতে বলেন, মুফতী আমিনীর মৃত্যুতে জাতি হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সঠিক ও সফল প্রতিনিধিত্বকারী এক অভিভাবককে হারালো। যার ফলে জাতি এ মুহূর্তে অভিভাবক হারা হয়ে পড়ল। ইসলামের সঠিক নেতৃত্ব দিতে গিয়ে দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার জন্য মুফতী আমিনী পদে পদে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলো নিতেন এবং যে সকল ভূমিকা রাখতেন তা তাঁর মেধা, কুরআন হাদীসের পারদর্শিতা, একনিষ্ঠতা ও উচ্চপর্যায়ের হিম্মত ও সাহসের পরিচায়ক বলে তিনি মন্তব্য করেন। মুফতী আমিনীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দা:বা:) ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরাসহ তাঁর পরিচালনাধীন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন জামিয়া ও মাদরাসাগুলোতে মুফতী আমিনীর রুহের মাগফিরাত কামনা করার লক্ষ্যে ওস্তাদ-ছাত্রবৃন্দদের নিয়ে খতমে তাহলীল ও দু'আ দরুদের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য এক দিনের ছুটি ঘোষণা করেন। হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দা:বা:) বসুন্ধরায় ফজরের নামায আদায় করার পর পর মুফতী আমিনীর লাশ দেখা ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগে পৌঁছেন। মরহুমের লাশ এক নজর দেখার সাথে সাথে তিনি কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করেন। পরে লালবাগ মাদরাসার অফিসে মরহুমের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তাদেরকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেন। এবং বলেন, মুফতী আমিনীকে হারিয়ে শুধু তোমরা একা শোকাহত নও। বরং তোমাদের সাথে আমরাসহ পুরো জাতি শোকাহত। পরদিন লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাহুতুম) মরহুমের জানাযায় অংশ নেন। তিনি বলেন, মরহুমের মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হয়েছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও তা পূরণ হওয়ার মত নয়, কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরতের বাইরেও নয়। তাই আমরা আল্লাহর দরবারে দু'আ করি যাতে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জাতির সঠিক দিক-নির্দেশনা দানকারী ও প্রতিনিধিত্বকারী অভিভাবক আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে দেন এবং মুফতী আমিনীর রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজগুলো সমাপ্ত করতে পারেন। আমীন

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هاهزوا اولئك لهم عذاب مهين۔

অনুবাদ : একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা লোকমান ৬)

তফসীর : উল্লেখিত আয়াতে اشترى শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোনো কোনো সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। اشتروا الضلالة بالهدى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন দেশে সফর করতেন। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমূখ আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদের বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসফেন্দিয়ার প্রমূখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কুরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ পোষণ করত এবং গোপনে গোপনে শুনতও, তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছুতা পেয়ে গেল। (রূহুল মা'আনী)

দুররে মনসূরে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, উল্লেখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবন থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্য সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এসো এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে; এতে لهو الحديث ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিসসা-কাহিনী অথবা গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে নুযুলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اشتراء শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لهو الحديث এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اشتراء শব্দটিরও স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

لهو الحديث বাক্যটিতে حديث শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لهو শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে لهو বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لهو বলা হয়, যার কোনো উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্য করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لهو الحديث এর অর্থ ও তাফসীর কি, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের (রা.) এর এক রেওয়ায়াতে তাফসীর করা হয়েছে গান-বাদ্য করা। (হাকেম, বায়হাকী)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদগণের মতে গাণ, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনী যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর এবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে সেগুলো সবই لهو الحديث - বুখারী ও বায়হাকী স্ব স্ব কিতাবে لهو الحديث এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন لهو الحديث هو الغناء واشباهه গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে (যা আল্লাহর এবাদত থেকে গাফেল করে দেয়)। বায়হাকীতে আছে لهو الحديث ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। ইবনে জরীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন। (রূহুল মা'আনী) তিরমিযীর এক রেওয়ায়াত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতঃপর তিনি বলেন এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কে ومن الناس من يشترى আয়াত নাযিল হয়েছে।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান : কয়েকজন সাহাবী উল্লেখিত আয়াতে لهو الحديث এর তাফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবীগণ ব্যাপক তাফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোনো খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়।

কুরআন পাকের لايشهدون الزور আয়াতে ইমাম আবু হানীফা, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেমগণ زور শব্দের তাফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান বর্ণিত হযরত আবু মালেক আশ'আরীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

"আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গাণ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শুকরে পরিণত করে দেবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম। (আহমদ, আবু দাউদ)

এতদভিন্ন বহু প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য হারাম ও না জায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

সর্বনাশা বিজাতীয় সংস্কৃতি

قال رسول الله ﷺ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قيل يارسول الله اليهود والنصارى قال فمن (متفق عليه)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবে ধীরে ধীরে সমান তালে এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাই করবে। আরজ করা হল হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়? উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তারা না হলে কারা? (বুখারী ও মুসলিম)

قال رسول الله ﷺ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام من شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها فى الآخرة (مسلم)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সর্ব প্রকার নেশাদায়ক জিনিস মদের অন্তর্ভুক্ত এবং সবধরনের নেশাদায়ক বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি ইহকালে মদ পান করে এবং তার অভ্যস্ত থাকাবস্থায় তওবা করা ব্যতীত মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে পরকালে শরাব পান করতে পারবে না। অর্থাৎ মদ্যপ আখেরাতের একটি বিরাট নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।"

قال رسول الله ﷺ ليكون من امتى اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف (بخارى)

"রাসুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মহিলাদের লজ্জাস্থান (সম্মতিক্রমে দৈহিক মিলনকে), রেশমী কাপড় পরিধান করা, মদ পান করা এবং বাদ্যবাদনাকে বৈধ মনে করবে। (বুখারী)

قال رسول الله ﷺ ليشربن ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم المعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير (ابن ماجه، ابو داود، ابن حبان)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোক অবশ্যই মদপান করবেন এবং তার নামকরণ করবে ভিন্ন নামে। তাদের সামনে ঢোল বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে আর গায়িকারা সুর পরিবেশন করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেসহ জমিন ধসিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করবেন। (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান)

قال النبى ﷺ فى هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ﷺ ومتى ذلك قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور (ترمذى)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এ উম্মতের মধ্যে ভুমিধস হবে, মানব আকৃতির বিকৃতি ঘটবে এবং পাথর বৃষ্টি হবে। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! তা কখন হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যখন গায়ক গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র এবং মদ পানের মত জঘন্য কাজের সয়লাব হয়ে যাবে।" (তিরমিযী)

قال رسول الله ﷺ استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر (نيل الاوطار)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, গান শোনা গোনাহ। গানের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া পাপ এবং এর দ্বারা আনন্দ উপভোগ করা কুফরী। (নাইলুল আওতার)

قال رسول الله ﷺ اياكم وسماع المعازف والغناء فانهما ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل (ابن صفراى فى الامالى)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা বাদ্য ও গান শোনা থেকে বিরত থাক। কারণ এই দু'টি জিনিস অন্তরে নেফাক অঙ্কুরিত করে। যেভাবে পানি তৃণলতা উৎপন্ন করে।

قال رسول الله ﷺ صوتان ملعونان فى الدنيا والاخرى مزمار عند النغمة ورنة عند المصيبة (مسند بزاز، بيهقى)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, দু' ধরনের আওয়াজ দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। সুরের তালে তালে বাঁশির আওয়াজ এবং বিপদের সময় বিলাপের আওয়াজ। (মুসনাদে বাজ্জার, বায়হাকী)

عن ابى عثمان الليثى قال قال يزيد بن الوليد الناقص يابنى امية اياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد فى الشهوة ويهدم المروءة وانه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فان قلتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء داعية الزنا وقال الضحاك الغناء منفدة للمال مسخطة للرب مفسدة للقلب۔ (عوارف المعارف)

"ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ বলেন, হে বনী উমাইয়া! তোমরা গান বাদ্য থেকে বিরত থাক। কেননা তা লজ্জা কমিয়ে দেয়, কামভাব বৃদ্ধি করে, আত্মমর্যাদা ধ্বংস করে এবং তা মাদকদ্রব্যের স্থালাভিষিক্ত... কেননা গান বাদ্য ব্যভিচারের প্রতি ধাবিত করে। হযরত জহহাক (রহ.) বলেন, গানবাদ্য ধন সম্পদ ধ্বংস করে, আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে এবং অন্তরকে বিনষ্ট করে। (আওয়ারিফুল মা'আরিফ)

শরীয়তের আলোকে 'ফরেক্স ট্রেডিং'

মুফতী শাহেদ রহমানী

বর্তমান সমাজে বেকরাত্ব, কর্মসংস্থানের অভাব, কর্মযোগ্যতার শূণ্যতা সর্বোপরি মানুষের লোভ লালসা বৃদ্ধির কারণে মানুষ ধন সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে সহজপন্থা আবিস্কারে ব্যস্ত সর্বদা। আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতি এতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এসবের সুযোগ নিয়ে দেশি বিদেশি মাড়োয়ারী দুর্বৃত্তরা মানুষের সহায় সম্বল হাতিয়ে নিতে আবিষ্কার করেছে নিত্যনতুন কুটকৌশল। কখনও তা এমএলএম পদ্ধতি, কখনও অনলাইন বিজনেস সিস্টেম। উদ্দেশ্য তাদের একটাই। মানুষের লোভকে কাজে লাগিয়ে হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া।

একজন মুসলমান, ইহকালীন জীবনই তার মুখ্য নয়, পরকালীন জীবনই তার মূল উদ্দেশ্য। তাই তার ইহকালীন জীবনের যাবতীয় কর্ম হবে পরকালীন জীবনের সফলতার লক্ষ্যে। পরকালের হিসাব নিকাশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ইহকালীন জীবনের আয় ব্যয়ের। একজন মুসলমান তার ধন সম্পদ কিভাবে আয় করেছে, ব্যয় করেছে কিভাবে (?) এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপর নির্ভর করবে তার পরকালীন জীবনের সুখ শান্তি। তাই প্রতিটি মুসলমান নর-নারীকে সম্পদ আহরণে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে- তার সম্পদ অর্জনের পদ্ধতিটি শরীয়ত সম্মত কি না? বর্তমান সময়ে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবিত হচ্ছে অসংখ্য ব্যবসা পদ্ধতি। মানুষও তা নিশ্চিন্তে সম্পদ অর্জনের লোভে গ্রহণ করে চলছে। অথচ একজন মুসলমানের জন্য পদ্ধতিটি শরীয়ত মতে বৈধ কি না তা জেনে নেওয়া খুবই জরুরী।

সম্প্রতি নবউদ্ভাবিত ব্যবসা পদ্ধতিসমূহের একটি হলো ফরেক্স ট্রেডিং। বর্তমান বিশ্বে যার প্রচলন তুঙ্গে। বেকার যুবসমাজের প্রচ- জোঁক এর প্রতি। ফরেক্স বিজনেস পদ্ধতিটি শরীয়া সম্মত কি না এ বিষয়ে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় ফতওয়া বিভাগ ও সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স বাংলাদেশ-এ লিখিত ও সরাসরি জানতে চেয়েছেন অনেকে। তাই এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে আজকের দরসে ফিকহ।

ফরেক্স ট্রেডিং কি?

ফরেক্স ট্রেডিং হলো অনলাইনে বিভিন্ন পণ্য ও বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করা।

যেভাবে করা হয় ফরেক্স ট্রেডিং :

বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে এই ব্যবসার সাথে জড়িত বহু কোম্পানি। লেনদেনের জন্য রয়েছে বিশাল অনলাইন মার্কেট। কোনো ব্যক্তি এই ব্যবসায় জড়িত হতে চাইলে প্রথমে তাকে কোনো একটি কোম্পানিতে নির্ধারিত অঙ্কের ডলার জমা করে একাউন্ট খুলতে হয়। একাউন্ট খোলার পর একাউন্ট হোল্ডার তার কম্পিউটারে অনলাইনের মাধ্যমে উক্ত মার্কেটের যাবতীয় পণ্য / মুদ্রার অবস্থান দেখতে পাবে। যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে ক্রেতা ও বিক্রেতার সাথে। ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে কোম্পানির মাধ্যমে তার স্ক্রিনে উদ্ভাসিত সকল পণ্য বা মুদ্রার। উল্লেখ্য যে, এই মার্কেটে মূলত ক্রয় বিক্রয় হয় মুদ্রা, পণ্য নামে মাত্র। যখন কোনো দেশের মুদ্রার মূল্য কমে যায় তখন তা ক্রয় করে নেয়, মূল্য বৃদ্ধি হলে তা বিক্রয় করে দেয়। এভাবে অর্জিত হয় মোনাফা বা লাভ। এই হলো ফরেক্স ট্রেডিংয়ের মৌলিক কাঠামো। তবে এর রয়েছে অসংখ্য নিজস্ব ট্রাম এন্ড কন্ডিশন। শরয়ী হুকুম জানার জন্য বিস্তারিত রূপরেখা উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়। বিধায় প্রয়োজনীয় অংশগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

☆ কোম্পানির একাউন্টে জমার পরিমাণ অনুপাতে একাউন্ট হোল্ডার ঋণ সুবিধা বা গ্রান্টি সুবিধা পাবে। যার উপর শর্ত সাপেক্ষে সুদ প্রদান করতে হবে। কোনো একটি পণ্য বা মুদ্রা ক্রয় করার পর তা ক্রেতার একাউন্টে জমা হয়েছে মর্মে স্ক্রিনে ভেসে উঠবে।

☆ বিক্রয় করলে তাও স্ক্রিনে দেখা যাবে তার একাউন্ট থেকে ওই পরিমাণ মুদ্রা বা পণ্য বিয়োগ হয়েছে।

☆ লাভ হলে তা একাউন্টে জমা হয়, লোকসান হলে তা মূল জমা থেকে কর্তন হয়।

☆ একটি মুদ্রা বা পণ্য ক্রয় করে তা বিক্রয় করার পর এটিকে বলা হয়, একটি ট্রেড সম্পন্ন হয়েছে।

☆ একটি ট্রেড সম্পন্ন হলে কোম্পানি নির্দিষ্ট হারে কমিশন নিয়ে থাকে, একাউন্ট হোল্ডারের লাভ হোক বা লোকসান।

☆ ক্রয়কৃত মুদ্রা বা পণ্য একাউন্ট হোল্ডারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না বা

এটি তার উদ্দেশ্যই নয়। বরং ক্রয় বিক্রয়ের তফাতে লাভ লোকসান বরাবর করে নেওয়াই তার মূল উদ্দেশ্য।

ফরেক্স ট্রেডিং এর শরয়ী হুকুম :

শরীয়তের ক্রয়বিক্রয় নীতিমালার আলোকে নিম্নোক্ত কারণে এই কারবার শরীয়ত সম্মত হতে পারে না।

১। মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের সময় উভয় পক্ষ ক্রেতা এবং বিক্রেতা প্রত্যেকে পারস্পরিক পৃথক হওয়ার পূর্বেই বিনিময়ে লেনদেনকৃত উভয় মুদ্রার উপর কবজ তথা করায়ত্ত্ব করতে হবে।

আল্লামা ওয়াহাবা আযযুহাইলী লেখেন–

التقابض قبل الافتراق بالابدان بين المتعاقدين : يشترط فى عقد الصرف قبض البدلين جميعا قبل مفارقة احد المتعاقدين للآخر افتراقا بالابدان ، منعا من الوقوع فى ربا النسيئة ولقوله ﷺ لا تبيعوا منهما غائبا بناجز۔ فان افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين او احدهما ، فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم لفوات شرط القبض والتقابض شرط سواء اتحد الجنس او اختلف۔ (আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৫/৩৬৬২)

(কবজ বা পজিশন ফিজিক্যালি তথা হাকীকীও হতে পারে অথবা কনস্ট্রাকটিভ তথা হুকমীও হতে পারে।)

ফরেক্স ট্রেডিংয়ে ক্রয় বিক্রয়ের পর কোনো প্রকারের কবজই প্রমাণিত হয় না। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র লাভ লোকসানের ভার গ্রহণ কবজের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং ক্রয়কৃত মুদ্রা বা পণ্য ক্রয়ের পর পৃথক করে ক্রেতা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক আয়ত্ত্ব করতে হবে।

২। ক্রয় বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য শরয়ী নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিক হলো বিক্রিতব্য পণ্য বা মুদ্রা বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকতে হবে।

ان يكون المبيع ملك البائع فى ان يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع ماليس مملوكا، ان ملكه بعده، الا السلم و المغصوب۔ (আলমাওসূআ আল ফিকহিয়্যা ৯/১৫)

অথচ অনলাইন মার্কেটে বিক্রেতার মালিকানা তো দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্যের অস্তিত্বই থাকে না।

উপরোল্লেখিত কারণসমূহের উপস্থিতিতে কোনো প্রকারের ক্রয়বিক্রয় শরীয়া সম্মত হতে পারে না। তদুপরি ফরেক্সট্রেডিংয়ে মূলত ক্রয় বিক্রয়ই হয় না। বরং তা শুধু কাল্পনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সহজ পন্থা। এর পেছনে না আছে পণ্য না আছে মুদ্রা। এটিকেই বলা হয় সাট্টা বা জুয়া।

যা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম।

ফরেক্স ট্রেডিং সম্পর্কে বিশ্ব বরেণ্য ফক্বীহ আল্লামা মুফতী তকী উসমানী সাহেব (দা.বা.) তাঁর এক ফতওয়ায় উল্লেখ করেন–

অর্থাৎ "নিম্নোক্ত কারণে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ব্যবসাটি শরীয়ত মতে বৈধ নয়।

১। আমাদের জানা মতে এই ব্যবসায় যখন কোনো লট ক্রয় করা হয় তখন ক্রেতাকে উক্ত লট সম্পূর্ণ পৃথক করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না বা ক্রেতার আয়ত্বে দেওয়া হয় না। শুধু তার একাউন্টে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর বিক্রি করে লাভ হলে তা দিয়ে দেয়, লোকসান হলে তা কর্তন করে নেয়।

সার কথা হলো ক্রয়কৃত লট কখনো ক্রেতার আয়ত্বে / কবজে দেওয়া হয় না। বরং কাগজপত্রে লেখে দেওয়া হয়। শেষে শুধু লাভ লোকসান বরাবর করে নেওয়া হয়। যা সাট্টা বা জুয়ারই নামান্তর।

২। উল্লেখ্য যে, মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিধানগত করায়ত্বের জন্য এইটুকু যথেষ্ট নয় যে, মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাসজনিত লাভ লোকসান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বহন করবে। বরং আয়ত্বের জন্য বিক্রিত মুদ্রাগুলো অবিক্রিত মুদ্রা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে নিতে হবে। অতঃপর ক্রেতা নিজে অথবা তার প্রতিনিধি দ্বারা তা এইভাবে কবজ করে নিতে হবে যদি উক্ত মুদ্রা চুরি বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যায় তার পূরা লোকসান ক্রেতাই বহন করবে।

স্পষ্ট যে, উল্লেখিত ব্যবসায় এই ধরনের কবজই হয় না। না মুদ্রা পৃথক করা হয়, না ক্রেতা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক কবজ করা হয়। আরো উল্লেখ্য যে, শরীয়ত মতে মুদ্রা এবং পণ্যের কবজের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পণ্যের কবজ ইশারা ইঙ্গিত বা কোনো চিহ্ন দ্বারা করা সম্ভব। কিন্তু মুদ্রার ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক কবজ করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রা নির্দিষ্ট হতে পারে না।

৩। উল্লেখিত পদ্ধতিতে ক্রেতা এক হাজার ডলার পরিমাণ আদায় করে অবশিষ্ট পাওনা বাকি থাকে। কোম্পানি এর জন্য গ্যারান্টি প্রদান করে। বাস্তবে তা ক্রেতারই ঋণ। অন্য দিকে বিক্রেতা ২নং ধারায় উল্লেখিত নীতিতে কবজও করে না। ফলে উভয় পক্ষ একে অপরের কাছে ঋণী হয়ে থাকে। বিনিময় লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ ঋণী হয়ে গেলে তা শরীয়ত মতে বৈধ নয়।

৪। কোম্পানি ক্রেতা থেকে যে কমিশন আদায় করে তা গ্যারান্টির বিনিময় হয় অথবা ঋণের বিনিময় হয়। উভয়টি শরীয়তে বৈধ নয়।"

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

১। হযরত (রহ.) বলেন, প্রত্যেকটি সুন্নাতে তিনটি শান (তথা মর্যাদা) আছে, ১.আজমাল ২. আসহাল। ৩. আকমাল। অর্থাৎ অতি সুন্দর, অতি সহজ, অতি পরিপূর্ণ। যেমন হাত ধৌত করে খানা খাওয়া আজমল তথা অতি সুন্দর। কেননা পরিস্কার হলেই সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। আর নিজের সম্মুখ থেকে খাওয়া আসহাল অর্থাৎ অতি সহজ আর বিসমিল্লাহ বলে খেলে পরিপূর্ণতা আসে। কেননা নেয়ামতের পরিপূর্ণতা তখন হবে যখন নেয়ামত দাতাকে স্মরণ করা হবে।

২। হযরত (রহ.) বলেন, যারা দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত তাঁদের উচিত আকাবিরদের খিদমতে যাতায়ত অব্যাহত রাখা। যেমন খুচরা ব্যবসায়ী ফেরিওয়ালা বড় ফ্যাক্টরী থেকে মাল সংগ্রহ করে, তারপর অন্যদেরকে সাপ্লাই করে। একদিক থেকে নেওয়া এবং অন্যদিকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে নফসের মধ্যে বড়ত্ববোধ আসে না। কিন্তু শুধু শাইখ বনে বসে থাকলে শয়তান অহংকার দ্বারা মাথা নষ্ট করে দেয়। হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলেন, যে নিজেকে মুসতাকিল বিজ্জাত তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করেছে সে মুসতাকিল বদজাত তথা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।

৩। হযরত (রহ.) বলেন, কথাবার্তা দ্বারা যেমন মুহাব্বত বাড়ে, কুরআন পাকের তিলাওয়াত যেহেতু আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলা, তাই কুরআনে পাকের তিলাওয়াত দ্বারা আল্লাহ পাকের মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। সাথে প্রতি অক্ষরে দশ নেকী এবং সে হিসাবে এক পারা তিলাওয়াতে লক্ষ লক্ষ নেকী হয়।

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.) এর কাছে লিখেন যে, কুরআন তিলাওয়াতে মন লাগেনা। হযরত (রহ.) উত্তরে লিখেন, একথা মনে কর আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমার কালাম শুনাও তো দেখি, কেমন পড়তে পার। তাই আল্লাহ পাককে শুনানোর জন্যই পড়ছি। পড়ার পুরস্কার ভিন্ন এবং বুঝার পুরস্কার ভিন্ন। যারা না বুঝে পড়াকে অহেতুক মনে করে তারা হয়ত জাহেল (অজ্ঞ) অথবা বদদ্বীন (পথভ্রষ্ট) এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীর বিরোধিতাকারী। কুরআনে পাকের হাফেজ বাস্তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহান মু'জিযা তথা আল্লাহ পাক প্রদত্ত নবুওয়াতের সনদের হিফাজতকারী। যারা রাষ্ট্রীয় সিমানা হিফাজত করে তাদেরকে যদি সরকারী মানুষ মনে করা হয়, কুরআনে পাক তথা আল্লাহ তা'আলার কালামের হাফেজদেরকে সরকারী রক্ষী বাহিনীর মর্যাদা কেন দেওয়া হবে না? এ প্রসঙ্গে হযরত (রহ.) বলেন, কুরআন পাকের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হক আছে। ১.সম্মান করা। ২.শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা। ৩. কুরআনী বিধানের উপর আমল করা। যদি ১০ মিনিট করে দৈনিক দুই মাস সময় দেওয়া হয়। তবে কুরআনের শব্দগুলো মৌলিক ভাবে শুদ্ধ হয়ে যায়। বৃদ্ধ মানুষ যদি বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিখার কাজে লেগে যায়, তবে আশা করা যায় এর বরকতে নাজাত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাকের দয়া হবে এজন্য যে, বৃদ্ধ হয়েও আমার কালাম শুদ্ধ করার কাজে লেগেছিল।

৪। হযরত (রহ.) বলেন, না মাহরাম মহিলাদের ফটো দেখা এজন্য হারাম যেহেতু তার আসল দেখা হারাম। যে বস্তুর আসল দেখা হারাম তার প্রতিচ্ছবি দেখা জায়েয হয় কিভাবে? তাই টেলিভিশনের মাসআলা এখান থেকে বুঝে নেওয়া যায়।

৫। হযরত (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি কাঁচা হয় অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি করেনি ওই ধরণের ব্যক্তি অর্থশালীদের হাতে বিক্রি হয়ে যায়। অথবা মাখলুকের ভয় বা অর্থ লোভের কারণে নিজের আত্মমর্যাদা এবং শরীয়তের নিয়মনীতি ভঙ্গ করে। তার একটি আশ্চর্য নমুনা আল্লাহ পাক দান করেছেন। যেমন একটি কাঁচা কলসে পানি ডালেন তো, দেখবেন কলসের মাটি গলে গিয়ে কলসের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। আর যদি কলসটি আগুনে পোড়ানো হয় তারপর পানি ভর্তি করা হয়, তবে ওই পানি কলসের অস্তিত্বকে বিলীন করতে পারবে না। বরং কলস নিজের ঠা-াগুণে পানিকে ঠা-া করে ফেলবে। এটাই আলেমে রববানীর উদাহরণ যিনি আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতে থেকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পাকাপোক্ত হন এরপর দ্বীন প্রচারের জন্য মানুষের সাথে মেলামেশা করেন, তখন ক্ষতির সম্মুখীন হননা। অর্থাৎ পদ এবং প্রসিদ্ধি লাভ করার মত কোন ফিৎনা তাকে বিনষ্ট করতে পারে না। হক্বের উপর অটল থাকার নেয়ামত তার নাগালে থাকে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক রাখার মানসিকতার কারণে আল্লাহ পাকের দিকে দৃষ্টি থাকে। শেষ পর্যন্ত কবরে এটাই কাজে লাগবে।

মলফূযাতে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক বসুন্ধরা মারকাযের জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনের উদ্দেশে এবং বিভিন্ন মাহফিলে প্রদত্ত সমসাময়িক মাওয়ায়েয ও বয়ান থেকে সংগৃহীত

☆ হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা আছে। এদেশের লোকদের অভ্যাস ও স্বভাবে افـــــراط تـفريط অর্থাৎ বেশিকরণ ও কমিকরণের প্রবণতা আছে। কেউ এবাদত বন্দেগীতে সদাসর্বদা নিয়োজিত আর কেউ এবাদতের ধারে কাছেও যায় না।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) এক বুযুর্গের আগমনের কথা শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাতে গেলেন। যাওয়ার পর দেখেন বুযুর্গ সাহেব জরুরতে গেছেন। আর তিনি যেখানে নামায আদায় করেছেন তা বালুময় হওয়ায় দেখা গেল সিজদার স্থানে হাতের যে ছাপ পড়েছে তাতে আঙ্গুল ফাঁকা। এই অবস্থা দেখে হাসান বসরী (রহ.) ওই বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত না করেই ফিরে আসতে লাগলেন। তাঁর সাথী ও মুরিদগণ আরজ করলেন, হুজুর ! অনেক কষ্ট করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন আর এখন সাক্ষাত না করেই চলে যাচ্ছেন কেন? হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, তাঁর সিজদায় হাতের আঙ্গুল ফাঁকা দেখে। যা সুন্নাত পরিপন্থী। সুন্নাতের খেলাফ করে কেউ বুযুর্গ হতে পারে না। তাই চলে যাচ্ছি।

☆ হযরত ওয়ালা বলেন– রমাজান মাসের রহমতের দিনসমূহে আমাদের তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দরূদ শরীফ ও ইস্তিগফারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে আমরা বুঝতে পারব, আমাদের উপর রহমত নাযিল হচ্ছে।

☆ হযরত বলেন, প্রত্যেক ভাল কাজ ও ভাল স্থানে ডানকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নিম্নমানের কাজ ও নিম্নস্থানে বামকে প্রাধান্য দেওয়া সুন্নাত। তাই খাওয়ার জন্যও ডান হাত ব্যবহার হবে। চামচও ডান হাতে ধরা হবে। কারো কারো মেজাযে এক ধরনের পোকা থাকে। ডান হাতের আঙ্গুলের সাথে খানার যে অংশ লেগে থাকে তারা সেগুলো সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। এটা সুন্নাত বিদ্বেষী হওয়ার পরিচয় বহন করে।

☆ হযরত বলেন, আমাদের যত আকাবিরকে খানা খেতে দেখেছি সবাইকে খানা খাওয়ার সময় চামচ ডান হাতে নিতে দেখেছি। আর তাঁরা কাউকে বাম হাতে চামচ ধরতে দেখলে কঠিন রাগান্বিত হতেন। হযরত ফক্বীহুল উম্মত মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.) এর শাগরিদ সাহারানপুরের অধিবাসী এক মাওলানা সাহেব বর্ণনা করেন, মাজাহেরে উলূমে শিক্ষকতা কালীন আমি হযরতের সাথে খানায় শরীক ছিলাম। খাওয়ার মাঝখানে আমি বাম হাতে পানি পান করি। হযরত (রহ.) নম্রতার সাথে বুঝিয়ে বললেন, বাম হাতে পানি পান করতে নেই, পানি ডান হাতে পান করবে। এর পর আরেকবার হযরতের সাথে এরকম ঘটনা হয়। সে বারও হযরত (রহ.) নম্রতার সাথে বুঝিয়ে দিলেন। তৃতীয়বার যখন এরকম ঘটনা ঘটল তখন হযরত (রহ.) জোরে একটি থাপ্পড় লাগিয়ে দিলেন। এর বরকতে পরবর্তীতে আমি কখনো খানা খাওয়ার সময় বাম হাতে পান করিনি। কখনও ভুলে বাম হাতে গ্লাস নিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ হযরত (রহ.) এর থাপ্পড়ের কথা মনে পড়ে যেত। ফলে মুখের কাছে যাওয়ার পূর্বেই গ্লাস ডান হাতে এসে যেত।

☆ সুন্নাতের নিয়তে ডান পাশ দিয়ে হাটলেও সওয়াব পাওয়া যাবে। মুসাফাহা ডান দিক থেকে করা উচিত। معـاشـرت আচার ব্যবহারে শরীয়তের খেয়াল রাখা চাই। হযরত থানভী (রহ.) এর অধিকাংশ কঠোরতা ও রাগ প্রদর্শন আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রমের কারণে হত।

☆ একথার উপর সবাই একমত যে, শান্তি কোথাও নেই। কিছু সুখ ও শান্তি থাকলে তা মসজিদ-মাদরাসায় আছে। কিছু কিছু আলেম (অনভিজ্ঞতার কারণে) কোনো অসুবিধায় পড়লে বিদেশ চলে যেতে চায়। অথচ যেখানে اصلاح তথা সংশোধনের সুযোগ ও পরিবেশ আছে, সেখানেই সে সুখ শান্তি পায় না। আর যেখানে এসলাহের সুযোগ নেই সেখানে সুখ শান্তি কিভাবে পাবে? হযরত ওয়ালা বলেন, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মসজিদ মাদরাসার পরিবেশ ছাড়া কোথাও শান্তি নেই।

☆ মৃত্যুর ব্যাপারে কারো হাত নেই। তাই মৃত্যু চাওয়া নিষেধ। তবে হায়াত বৃদ্ধি, হায়াতে বরকত ইত্যাদি চাওয়া যায়।

☆ আপনি একজন আলেম হয়ে মসজিদ মাদরাসার খেদমত ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা, বিদেশ গমন ইত্যাদির দিকে যেতে চাচ্ছেন, আপনি কি কখনও চিন্তা করেছেন ওই সব কাজে কল্যাণ ও উন্নতি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই

বরং ক্ষতির আশংকা রয়েছে। মাদরাসা মসজিদে কিছু অসুবিধা আছে তাই বলে মসজিদ মাদরাসা বাদ দিয়ে আরো বেশি অসুবিধা ও ক্ষতির দিকে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

☆ হযরত বলেন, মাদরাসার সব আসাতিযায়ে কেরাম যদি সুন্নাত যিন্দা করার মেহনত করে তখন মাদরাসায় কোনো অসুবিধা ও ফিতনা ফাসাদ থাকবে না।

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, মাদরাসায় যে কোনো কাজ করার সময় হেকমত তথা পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। শিক্ষা বিষয়ক কাজেও হেকমতের খেয়াল করা চাই। তরবিয়তমূলক কাজে তো হেকমতের প্রতি নজর দেওয়া আরো বেশি প্রয়োজন।

☆ কাজের দ্বারা অন্যের উপর প্রভাব পড়ে। কথার দ্বারা নয়। হ্যাঁ, কথার দ্বারা প্রভাবের মধ্যে শক্তি তৈরী হয়। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরার আদর্শ ও নিয়মনীতি অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা না করে শুধু বসুন্ধরার কথা বলার দ্বারা প্রভাব সৃষ্টি হবে না। সুলূক ও তরীকতের পথিক যদি প্রথমেই মুখ চালু করে ফেলে তখন তার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হবে না। কথাতো বাতাসে উড়ে যাবে। হযরত থানভী (রহ.) এর আখলাকে প্রভাবিত হয়ে খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.) জিজ্ঞেস করেছিলেন–

تو مجمل از جمال کیستی
تو مکمل از کمال کیستی

কার সৌন্দর্য আহরণ করে আপনি সুন্দর হলেন, কার গুণে আপনি গুণান্বিত হলেন। সাথে সাথেই হযরত থানভী (রহ.) এর জবাব–

من مجمل از جمال حاجیم
من مکمل از کمال حاجیم

আমি আমার শায়খ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. এর কাছ থেকে সৌন্দর্য আহরণ করেছি। আমি হাজী সাহেব (রহ.) এর গুণে গুণান্বিত হয়েছি।

☆ হযরত বলেন, বড়ই আশ্চর্যের কথা, মাদরাসার মুহতামিম সাহেব ও অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরাম সর্বদা তালেবে ইলমের সংশোধনের চিন্তায় চিন্তিত থাকেন। অথচ নিজের ইসলাহের কোনো ফিকির রাখেন না।

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, খাজা সাহেব (রহ.) এর দ্বীনি পরিচিতি দেখে তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের জাতীয় কবি জিগর মুরাদাবাদী প্রভাবিত হলেন। তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তন হয়ে গেল। জিগর মুরাদাবাদীর পরিবর্তনের পিছনে তার হিম্মত ও দৃঢ় ইচ্ছার বড় ভূমিকা ছিল।

☆ হযরত বলেন, মানুষকে যেহেতু দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই মানুষের সব কাজের মধ্যে দূর্বলতার একটা ছাপ থাকে। হিম্মত ও ইচ্ছার মধ্যেও দূর্বলতা থাকে। তাওবাও দূর্বল হয়। তাওবা করার পর আবার গোনাহ করে বসে। এই দূর্বলদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রহমতুল লিল আলামীন বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। রহমতের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ما أصر من استغفر و ان عاد فی الیوم سبعین مرة (رواه الامام ابوداود فی السنن ، کتاب الصلاة ، باب فی الاستغفار (١٥١٤) والامام الترمذی فی السنن ، کتاب الدعوات ، باب دعاء النبی ﷺ ١٠٧ (٣٥٥٩) بلفظ "ولو فعله فی الیوم ---"

"যদি কোনো ব্যক্তি গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর এস্তেগফার করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে গোনাহ মাফ চায় তাকে গোনাহগার হিসেবে গণ্য করা হবে না। যদিও সে দিনে সত্তরবার ওই গোনাহ করে বসে।

☆ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) মক্কা শরীফ থেকে হজরত থানভী (রহ.) এর কাছে চিঠি লিখলেন, বললেন, যদি কখনও কানপুর মাদরাসা থেকে তোমার দিল ওঠে যায় তখন আমাদের খানকাহ-এ বসে যাবে।

☆ হযরত হাজী সাহেব (রহ.) এর থানাভবনের খানকাহ ১২৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৭ ঈসায়ী সনে বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৫ হিজরী সনে হযরত থানভী (রহ.) এসে আবাদ করেন। অথচ তখন হযরতের না কোনো জমিজমা ছিল, না অন্য কোনো আসবাব ছিল। কিন্তু হযরতের এখলাস ওয়ালা হিম্মতের বরকতে খানকাহ আবাদ হয়। এই খানকাহ এর বদৌলতে হযরত থানভী (রহ.) হাকীমুল উম্মত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ থানাভবনের নাম বাকী থাকবে।

☆ হযরত বলেন, تردد তথা সংশয়ের অবস্থায় বরকত আসে না। ইয়াকীন ওয়ালা হিম্মত থাকলে বরকত পাওয়া যায়। একদা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) আপন শায়খ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) এর কাছে চাকরী ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। জবাবে হাজী সহেব (রহ.) বললেন, এখন চাকরী ছাড়বেন না। কারণ, পরামর্শ চাওয়ার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আপনার অন্তরে تردد তথা সংশয় আছে। এমতাবস্থায় আপনি চাকরি ছেড়ে দিলে বিকল্প যদি কোনো ব্যবস্থা না হয় তখন আপনি কঠিন পেরেশানীতে পড়বেন। আর যখন সময় হবে তখন পরামর্শ চাওয়া ছাড়াই এমনিতেই চাকরী ছেড়ে দিবেন।

“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ-৬

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরীনে কেরাম সকলেই মাযহাবপন্থী ছিলেন :

পূর্বোক্ত আলোচনা ও গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের স্বীকারোক্তির পর একথা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, ইসলামে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সর্বযুগেই উম্মতে মুসলিমা কোন না কোন মুজতাহিদ ও স্বীকৃত মাযহাব অনুসরণ করে দ্বীন ধর্ম পালন করে আসছে। তথাপি আত্মপ্রশান্তির জন্য পাঠকের খিদমতে কুরআনের ধারক-বাহক মুফাসসিরীনে কেরামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করতে চাই। যারা স্ব-স্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির ও কুরআন বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মাযহাব চতুষ্টয়ের কোন না কোন একটির মুকাল্লিদ ছিলেন।

ক্র. নং	নাম	মৃত্যু সন (হিজরী)	কিতাব	মাযহাব
০১	ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল জাসসাস	৩৭০	আহকামুল কুরআন (তাফসীরুল জাসসাস)	হানাফী
০২	নসর ইবনে মুহাম্মদ	৩৭৩	তাফসীরে সমরকন্দী	হানাফী
০৩	আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ	৭০১	তাফসীরে নাসাফী	হানাফী
০৪	মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুস্তাফা	৯৫২	তাফসীরে আবিস সউদ	হানাফী
০৫	কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি	১২২৫	তাফসীরে মাযহারী	হানাফী
০৬	ইসমাঈল হাক্কী	১১২৭	রুহুল বয়ান	হানাফী
০৭	শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলূসী	১২৭০	রুহুল মা’আনী	হানাফী
০৮	মাওলানা আশরাফ আলী থানভী	১৩৬২	বয়ানুল কুরআন	হানাফী
০৯	মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী	১৩৯৬	মা’আরিফুল কুরআন	হানাফী
১০	মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী	১৩৯৪	মা’আরিফুল কুরআন	হানাফী
১১	আলী ইবনে মুহাম্মদ আত তাবারী	৫০৪	তাফসীরে তাবারী	শাফেয়ী
১২	হুসাইন ইবনে মাসউদ বগবী	৫১০	তাফসীরে বগবী	শাফেয়ী
১৩	মুহাম্মদ ইবনে উমর (ইমাম রাযী)	৬০৬	তাফসীরে কাবীর	শাফেয়ী
১৪	আব্দুল্লাহ ইবনে বাইযাবী	৬৮৫	তাফসীরে বাইযাবী	শাফেয়ী
১৫	আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ	৭৪১	তাফসীরে খাযেন	শাফেয়ী
১৬	ইসমাঈল ইবনে আমর আদ দিমাশকী	৭৭৪	তাফসীরে ইবনে কাসীর	শাফেয়ী
১৭	জালালুদ্দীন মহল্লী	৮৬৪	তাফসীরে জালালাইন	শাফেয়ী
১৮	জালালুদ্দীন সুয়ূতী	৯১১	জালালাইন ও আদদুররুল মানসূর	শাফেয়ী
১৯	মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শিরবীনী	৯৭৭	তাফসীরে খাতীব	শাফেয়ী
২০	মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আন্দালুসী	৫৪৩	আহকামুল কুরআন	মালেকী
২১	আব্দুল হক ইবনে গালেব	৫৪৬	তাফসীরে ইবনুল আতিয়্যা	মালেকী
২২	আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আস সা’আলাবী	৮৭৬	আল জাওয়াহিরুল হিসান	মালেকী
২৩	মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী	৬৭১	তাফসীরে কুরতুবী	মালেকী
২৪	মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আন্দালুসী	৭৪৫	আল বাহরুল মুহীত (তাফসীরে আবী হাইয়ান)	মালেকী
২৫	ইবনে আদেল আবী হাফস	৮৮০ এর পরে	তাফসীরুল লুবাব ফী উলুমীল কুরআন	হাম্বলী
২৬	ইবনে রজব	৭৯৫	তাহকীকু তাফসীরিল ফাতিহা	হাম্বলী

বড় বড় হাদীস বিশারদগণ নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করতেনঃ

শুধু মুফাসসিরীনে কেরামই নন বরং মুহাদ্দিসীনে কেরাম যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী, মুজাহাদার বদৌলতে হাদীসে নববীর সুবিশাল ভা-ার আজও পর্যন্ত অবিকলভাবে বিদ্যমান তাঁরাও কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করে চলতেন। তাঁরা কেউ নিজের লেখা হাদীসের কিতাব অনুযায়ী চলেননি বা কাউকে ইমাম বাদ দিয়ে তাঁদের কিতাব অনুযায়ী চলতে বলেননি।

উদাহরণতঃ ইমাম বুখারী , ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রা.) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

(আত তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ ১/৪২৫-৪২৬)

তাহাবী শরীফ প্রণেতা ইমাম তাহাবী (রহ.) হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (মা'আরেফুস সুনান ১/৮২-৮৩)

কী আশ্চর্য! এত বড় বড় হাদীস বিশারদগণও নিজ নিজ কিতাবের উপর আমল না করে চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব অনুসরণ করেছেন। এমন কি উপর্যুক্ত কোন একজন মুহাদ্দিসও নিজ নিজ কিতাবের ভূমিকায় একথা বলেননি যে, তোমরা আমার এই কিতাব পড়ে পড়ে দ্বীন পালন করবে। বরং তাঁরা দ্বীন পালনের উদ্দেশ্যে মাসআলা মাসাইল ও ফাতাওয়া জানার জন্য লোকদেরকে মাযহাবের ইমামদের শরণাপন্ন হতে বলতেন।

উদাহরণতঃ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত ইয়াজীদ ইবনে হারুন (রহ.) তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, যুহাইর ইবনে হারব ও অন্যান্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিসীনদের নিয়ে এক মজলিসে বসে ছিলেন, ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এসে কোন ব্যাপারে তাকে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, আমাদের নিকট কেন এসেছো, কোন ইলমওয়ালার নিকট যাও। উপস্থিত শাগরেদদের মধ্যে আলী ইবনুল মাদীনী প্রশ্ন করলেন, জনাব! আপনার নিকট উপস্থিত এই বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণ কি আহলে ইলম নন? তিনি উত্তর দিলেন, না, আহলে ইলম তো ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর শাগরেদগণ। (ইরশাদুল ক্বারী ৩২) অর্থাৎ ফিকাহবিদগণ প্রকৃত আহলে ইলম। এ কথাটি ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও তাঁর জামে'তিরমিযী হাদীস নং ৯৯০ এর শেষে উল্লেখ করেছেন। নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি আস্থাশীল বন্ধুগণ এ ঘটনা থেকে নিজেদের কর্মকা- ও পদক্ষেপ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

যা হোক, বলছিলাম মুহাদ্দিসীনে কেরামও কোন না কোন মাযহাব অনুসরণ করে চলতেন। তবে প্রশ্ন থেকে যায়- কেন? কেন তাঁরা নিজেরা মুজতাহিদ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও নিজ নিজ হাদীসের কিতাবের উপর আমল না করে মাযহাবের অনুসরণ করতেন?

এর উত্তর ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কুতুবে সিত্তাহর দরস প্রচলনকারী হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এর বক্তব্য থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। "ফুয়ূযুল হারামাইন" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, আমার খেয়াল ছিল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কুরআন হাদীসের যে ইলম দান করেছেন তার আলোকে (কোনো মাযহাবের তাকলীদ না করে) নিজে নিজেই মাসআলা বের করে চলতে থাকি। কিংবা আমি যাঁদের নিকট হাদীসের কিতাব পড়ে এসেছি যাঁরা শাফেয়ী অথবা মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের মাযহাব অনুসরণ করি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমে আমাকে হানাফী মাযহাব মানতে বাধ্য করা হয়েছে যে, 'হে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ভারতবর্ষের সাধারণ মুসলমানগণ সকলেই হানাফী, কাজেই এখানে তোমাকে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতে হবে"। দেখুন এত অগাধ ইলম ও পা-িত্যের অধিকারী ব্যক্তিকে পর্যন্ত নিজ ইলম অনুযায়ী চলার অনুমতি দেয়া হয়নি। এমনকি শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মানারও এজাযত দেয়া হয়নি। কারণ এ অঞ্চলের মুসলমানগণ হানাফী হওয়ায় তিনি যদি অন্য মাযহাব গ্রহণ করতেন তাহলে তার ইলম দ্বারা ভারতবর্ষের মুসলমানদের কোনো উপকার হতো না।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাযহাব অনুসরণের আরেকটি কারণ এ-ও যে, যুগ ও সময়ের বিবেচনায় তাঁরা ছিলেন মাযহাবের ইমামগণ বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর শিষ্য কিংবা শিষ্যের শিষ্য পর্যায়ের। ফলে এক দিকে ইমামুল মাযহাবগণের জ্ঞান-পা-িত্য ও দ্বীনী খেদমত সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সম্যক অবগত, অপরদিকে তাঁরা ইলম অর্জন করে হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলন করার বহু আগেই মুজতাহিদ ইমামগণ নিজেদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হাদীস ভা-ার থেকে সারনির্যাস বের করে ফিকহ সংকলন করে রেখে গিয়েছিলেন। কাজেই একজন মুহাদ্দিসকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সর্বপ্রথম মাযহাবের ইমাম সংকলিত ফিকহের আলোকে দ্বীনের অনুসরণ করে তারপর মুহাদ্দিস হতে হয়েছে। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত সহীহ বুখারীর কোনো কোনো

বাব ও শিরোনাম যা "ফিকহুল বুখারী" হিসেবে প্রসিদ্ধ ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের বিপরীত লক্ষ্য করা যায়। তাহলে কিভাবে তাকে শাফেয়ী বা মাযহাবপন্থী বলা যায়। এর জবাব হল, মাযহাবপন্থী হওয়ার পাশাপাশি তিনি মুজতাহিদে মুতলক পর্যায়ের ব্যক্তিত্বও ছিলেন। কাজেই ক্ষেত্র বিশেষে দলীলের ভিত্তিতে ইমামুল মাযহাবের বিপরীত মত পোষণ করায় তাকে "লা মাযহাবী" বলে প্রচার করার সুযোগ নেই। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর সুযোগ্য শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) কোন কোন মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এ জন্য তাঁরা কী ইমাম আবু হানীফার অনুসারী ছিলেন না? তবে এ কাজটি একমাত্র মুজতাহিদ পর্যায়ের লোকের জন্য বৈধ, যে কোন আলেম এমনটি করতে পারবে না। করলে সে গোমরাহ সাব্যস্ত হবে। বলছিলাম, মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর শিষ্য কিংবা শিষ্যের শিষ্য। এটা কোনো মৌখিক কাব্য নয়। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন-

শাজারায়ে মুবারকাহঃ

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাত: ১১ হিজরী
↓
(শিষ্য) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মৃত্যু:৩২ হিজরী
↓
(শিষ্য) আলকামা (রহ.) মৃত্যু: ৬২ হিজরী
↓
(শিষ্য) ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) মৃত্যু:৯৬ হিজরী
↓
হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান মৃত্যু: ১২০ হিজরী
↓
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মৃত্যু: ১৫০ হিজরী
↓
ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মৃত্যু: ১৮৯ হিজরী
↓
ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মৃত্যু: ২০৪ হিজরী
↓
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) মৃত্যু: ২৪১ হিজরী
↓
ইমাম বুখারী (রহ.) মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী
↓
ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম তিরমিযী (রহ.)

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর একেবারে নাতিপোতা পর্যায়ের শিষ্য বরং তিনি আরও একধাপ পরবর্তী স্তরের। আর ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী (রহ.) তো তাঁর চেয়েও নিচের ধাপের শিষ্য। সুতরাং তাঁরা মাযহাব মেনেই বড় হয়েছেন, মুহাদ্দিস হয়েছেন এবং কেউ তাঁদের কিতাবের মধ্যে মাযহাব মানার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেননি। আল্লাহ মাফ করুন। উপর্যুক্ত আলোচনা ও চিত্র প্রদর্শন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও মুহাদ্দিসীনে কেরামের (আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দারাজাতকে আরও বুলন্দ করে দিন) মর্যাদা খাটো করা নয়। বরং এর দ্বারা নবীযুগের সঙ্গে ইমামুল মাযহাব ও ইমামুল মুহাদ্দিসীনের সংশ্লিষ্টতার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরাই মূল উদ্দেশ্য। যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়গভীরে মাযহাবের ইমামদের সত্যিকার মর্যাদা পূর্ববৎ জাগরুক থাকে যা কতিপয় অপরিনামদর্শী লামাযহাবী বন্ধুদের চেঁচামেচিতে সন্দেহের আবরণে ঢাকা পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল, বস্তুত! আল্লাহ তা'আলাই সত্যকে উন্মোচন করে দিয়েছেন।

নির্দিষ্ট মাযহাব মানার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা ও ঐকমত্যঃ

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শরীয়তের মৌলিক ও স্পষ্ট বিধি-বিধান ও আক্বীদাগত বিষয়ে কোন ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রান্তিক ও শাখাগত অনেক মাসাইলের ক্ষেত্রে যেহেতু কুরআন ও হাদীসে বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় আর দলীল প্রমানের আলোকে বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ একাধিক আয়াত বা হাদীসকে সামনে রেখে আমলযোগ্য সিদ্ধান্তটি খুঁজে বের করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়,এ জন্য সে সকল বিষয়ে আমল করতে গিয়ে কোন মুজতাহিদ ইমামের মতামত তথা মাযহাব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মাযহাব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং শরীয়তের পক্ষ থেকে তার অনুমোদন বরং জরুরী হওয়ার বিষয়টি আমরা পূর্বের দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি। এখন যে বিষয়টি জানা দরকার তা হল, উলামা ও ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত যে, বর্তমানে চার ইমামের মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব গ্রহণ করা বৈধ নয়। সুতরাং চার ইমামের মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি তা তিনি যত বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্নই হোন না কেন তার মাযহাব গ্রহণ করা ইজমায়ে উম্মত অর্থাৎ উম্মতের সর্ববাদী সিদ্ধান্তের খেলাফ হবে বা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয নয়।

এ বিষয়ক কিছু উক্তি পেশ করা হচ্ছে-

১। গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের মান্যবর ইমাম, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) (মৃত্যু:৭২৮হি:) চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মুজতাহিদের মাযহাব মানা যাবে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

الاجماع اليوم قدانعقد على خلاف هذا القول ـ

অর্থ: এর বিপরীতে (চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মুজতাহিদের মাযহাব না মানার ব্যাপারে) আজ ইজমা

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ২০/৫৮৪)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হল, উম্মতের ঐকমত্যে বর্তমানে চার ইমামের মাযহাব অনুসরণযোগ্য।

২। প্রখ্যাত হাদীস গবেষক ও বিশ্লেষক ইমাম যাহাবী (রহ.) (মৃত্যু:৭৪৮ হি:) বলেন,

فيمتنع تقليد غير الاربعة فى القضاء والإفتاء لان المذاهب الاربعة انتشرت تحررت ـ

অর্থ: মাসআলা মাসাইল সংক্রান্ত ফাতাওয়া ও আদালতের ফায়সালার ক্ষেত্রে চার ইমাম ব্যতীত অন্য কারো তাকলীদ ও অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা এই চার মাযহাব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা কিতাবাকারে সংকলিত হয়েছে। (ফয়জুল কাদীর ১/২৬৯ ও ২৮৮)

৩। ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) (মৃত্যু:৮০৮হি:) তার জগৎবিখ্যাত গ্রন্থ তারীখে ইবনে খালদুনে লিখেছেন-

وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هؤلاء الائمة الاربعة ـ

অর্থ: এ যুগে ইসলামের অনুসারীগণ এই চার ইমামের একজনকে তাকলীদ (অনুসরণ) এর জন্য বরণ করে নিয়েছেন। (তারীখে ইবনে খালদুন ১/৪৭৯)

৪। বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) (মৃত্যু:৯৭০ হি:) বলেন,

وماخالف الائمة الاربعة فهو مخالف للاجماع ـ

অর্থ: যে মাযহাব ও মতামত ইমাম চতুষ্টয়ের বিপরীত হবে তা মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা সর্ববাদী সিদ্ধান্তের বিরোধী হিসেবে বিবেচিত হবে। (আল আশবাহ-১৬৯)

৫। ভারতবর্ষের বিখ্যাত ফকীহ ও ফিকহের মূলনীতি বিশেষজ্ঞ শায়খ আহমদ মোল্লা জীয়ূন (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ তাফসীরে আহমাদিয়াতে লিখেন-

قد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للاربع .....وكذا لا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم ـ

অর্থ: কেবল ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদই বৈধ হবে, এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপ এদের বিপরীতে কোন নব্য মুজতাহিদের অনুসরণ বৈধ হবে না। (তাফসীরে আহমাদিয়্যা পৃ:৩৪৬)

৬। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) (মৃত্যু:১১৭৬ হি.) বলেন,

ان المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة اومن يعتد به منها على جواز تقليد ها الى يومنا هذا ـ

অর্থ: সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ এই চার মাযহাবের অনুসরণের বৈধতার উপর আজও পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ বা উম্মাহর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/২৮৬)

উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা জানা গেল, দ্বীন মানতে হলে উম্মতকে আজ চার মাযহাব অনুসরণ করতে হবে। এর বাইরের কোনো মাযহাব মানা হলে সেটা হবে ইজমার পরিপন্থী যা অবৈধ ও নাজায়িয এবং স্পষ্ট গোমরাহী। প্রশ্ন উঠবে চার ইমামের মাযহাবই যখন সহীহ ও অনুসরণযোগ্য তাহলে সকল বিষয়ে চারজনের একজনকে কেন মানতে হবে? যে বিষয়ে যখন যাকে খুশি তাকে অনুসরণ করা কেন বৈধ হবে না?

বন্ধুগণ! সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন একই সঙ্গে সকল ইমামের তাকলীদ বৈধ হবে না বা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জনের অনুসরণ বৈধ হবে না এ ব্যাপারে তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তার সঙ্গে এখন এটুকু জেনে রাখুন। মাযহাবসমূহ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে যেমন চার মাযহাবের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি অনুসরণের ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তির জন্য চার মাযহাবের মধ্য থেকে কেবল যে কোন একটিকে গ্রহণ করা বৈধ ও একাধিক মাযহাব গ্রহণ করা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারেও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে একাধিক মাযহাব মানা বাস্তবতার নিরিখেই যেমন অসম্ভব তেমনি মনের চাহিদা অনুযায়ী যখন যে মাযহাব মনে চায় অনুসরণ করাও বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির খেলাফ। কেননা শয়তানের সহযোগী নফসে আম্মারা তথা কুপ্রবৃত্তির অধিকারী মানুষের জন্য তা হবে প্রবৃত্তিপূজার হাতিয়ার। বিষয়টি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে আরও সুস্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

১। গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.)বলেন,

فيكونون فى وقت يقلدون من يفسده وفى وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لايجوز باتفاق الائمة ونظير هذاان يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار اذا كان طالبا لها ويعتقد عدم الثبوت اذا كان مشتريا فان هذا لايجوز بالاجماع .....لان ذالك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة الى ان يكون التحليل والتحريم بحسب الاهواء ـ

অর্থ: স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুকূলে হলে তারা সেই ইমামের অনুসরণ করে যিনি তাদের স্বার্থ অনুযায়ী বিষয়টি নাজায়িয বলে ফতওয়া দেন। আবার স্বার্থের বিপরীত হলে সেই একই ব্যক্তিবর্গ এমন ইমামের অনুসরণ করেন যিনি বিষয়টি জায়িয বলে ফতওয়া দেন। প্রবৃত্তির

এমন লাগামহীন গোলামী সকল ইমামের মতেই নাজায়িয ও অবৈধ। এ জাতীয় বিষয়ের একটি উদাহরণ হল, নিজে প্রতিবেশী ও দাবীদার হলে প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে 'শুফ'আর হক' বৈধ বলা আর নিজে ক্রেতা হলে প্রতিবেশীর জন্য শুফ'আর হক অবৈধ বলা। এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতি বিষয়ে স্বার্থের অনুকূল মাযহাব অনুসরণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ইজমা তথা সকলের ঐকমত্যে বৈধ না। কারণ এটা দ্বীন নিয়ে খেলতামাশার পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী হারাম-হালাল নির্দিষ্ট করনের পথ খুলে দেয়। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ৩২/১০০-১০১)

২। বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী তকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) নির্দিষ্ট এক ইমাম মানার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যের কথাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

فلو ابيح لكل احد ان ينتقى من هذه الاقوال ماشاء متى شاء لأدى ذالك الى اتباع الهوى دون الشريعة الغراء وبالتالى فان كل واحد من هذه المذاهب له نظام خاص يعمل فى اطاره بحيث ان كثيرا من مسائله مرتبط بعضها ببعض فلو اخذ منه حكما وترك حكما اخر يرتبط به لاختل ذالك النظام وحدثت حاله من التلفيق لا يقول بصحتها احد .....ومن هنادعت الحاجة الى التمذهب بمذهب معين ـ

অর্থ: মনের অনুকূলে স্বাধীন মত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলে প্রবৃত্তির অনুসরণের পথই কেবল উন্মুক্ত হবে, নিখাঁদ শরীয়তের অনুসরণ হবে না। ..... দ্বিতীয়ত: মাযহাবগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, আমলের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা যার ভিত্তিতে সেখানে আমল করা হয়। ফলে দেখা যায় অনেক মাসআলাই একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং যদি কোন একটি বিধানকে গ্রহণ করে তার সম্পর্কযুক্ত অপর বিধানকে বর্জন করা হয় তাহলে মাযহাবের মূলনীতি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে এবং প্রবৃত্তি অনুসরণের পথ সৃষ্টি হবে যাকে পরিভাষায় তালফীক বলা হয়। যা বৈধ হওয়ার কথা কেউ আদৌ বলেন না।...আর একারণেই নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। (উসূলুল ইফতা পৃ:৬৩-৬৪)

৩। বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিয়াজুস সালেহীন প্রণেতা আল্লামা নববী (রহ.) (মৃত্যু: ৬৭৬ হি:) বলেন,

انه لو جاز اتباع اى مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذالك يؤدى الى انحلال ربقة التكليف ...فعلى هذا يلزمه ان يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين ـ

অর্থ: মনের খেয়ালখুশি অনুযায়ী স্বাধীন মতো যে কোন মাযহাবের অনুসরণ বৈধ হলে তা মানুষকে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মাযহাবসমূহের সহজ সুবিধাজনক ও অনুকূল বিষয়গুলো লুটে নেয়া এবং হারাম-হালাল, ও আবশ্যকীয় ও বৈধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে মনের পছন্দসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দিকে ঠেলে দিবে। আর এহেন মনোভাব শরয়ী বাধ্যবাধকতার লাগাম অবমুক্ত করে দিবে। সুতরাং অনুসরণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোন মাযহাব নির্বাচনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। (আল মাজমু' শরহুল মুহাযযাব। ভুমিকা অংশ ১/১২০-১২১)

৪। হাফেজে হাদীস আল্লামা যাহাবী (রহ.) বলেন,

وعلى غير المجتهد ان يقلد مذهبا معينا ـ

অর্থ:গাইরে মুজতাহিদ অর্থাৎ কুরআন হাদীস ও শরীয়তের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও সল্প অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব অনুসরণ করে আমল করা অপরিহার্য। (ফয়জুল কাদীর ১/২৬৯)

৫।হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন,

اعلم ان الناس كانوا فى المائة الاولى والثانية غير مجتمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه وبعد المائتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهد ين باعيانهم ...وعلى هذا ينبغى ان القياس وجوب التقليد لامام بعينه ـ.

অর্থ: মুসলমানগণ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকে নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না অর্থাৎ তখন পর্যন্ত এর প্রয়োজন দেখা যায় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের পর নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাবসমূহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ..সুতরাং নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া বুদ্ধি-বিবেচনারই দাবী। (আল ইনসাফ পৃ:৬৮-৭০)

উপর্যুক্ত পাঁচটি বক্তব্যের প্রথম দুটি নির্দিষ্ট করে যে কোন একজন ইমামের মাযহাব অনুসরণের বাস্তবতা ও এতদ্ব সংক্রান্ত ইজমা তুলে ধরেছে আর পরবর্তী বক্তব্যগুলো তাকে আরও জোরধার করে তুলেছে। সুতরাং বর্তমানে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণ ব্যতীত কোন বিকল্প নেই। এর বিরোধিতাকারীর জন্য রয়েছে কুরআনে বর্ণিত গোমরাহী ও জাহান্নামের শাস্তি।(সুরা নিসা-১১৫) আল্লাহ হিফাজত করেন। আমীন।

লেখক : শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামিয়া রহমানিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

শেয়ার বাজার
শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা-৪

মাওলানা মুফতী এনামুল হক কাসেমী

প্রথম দলিলে আপত্তিঃ

এখানে অনেকে আপত্তি করেন যে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যার কথাকে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যার কথার উদ্দেশ্য হলো, যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হারাম মালকে হালাল মালের সাথে মিলিয়ে ফেলে তাদের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হবে। যেমন, কোন ব্যক্তি কোন পণ্য কিনলো অতঃপর তারমধ্যে হালাল এবং হারাম মাল মিশে গেল। এক্ষেত্রে সকল মাল হারাম হবেনা, বরং হারামের বিধান হারাম মালের মধ্যেই প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোম্পানির শরিক হওয়ার জন্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা তার চেয়ে ভিন্নতর। তাই এক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়্যার কথা প্রযোজ্য হবেনা।

তা ছাড়া ইবনে তাইমিয়্যার এই কথা প্রযোজ্য হবে ওই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে যারা হারাম মাল ত্যাগ করে তওবা করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী। যারা এই উসুল কে অবলম্বন করে হারাম মালে জড়িত হতে চায় তাদের জন্য নয়।(প্রাগুক্ত)

আপত্তির উত্তরঃ

কোম্পানি যেহেতু পরিচালনা করে বোর্ড অব ডাইরেক্টর এবং এখানে শেয়ারহোল্ডারদের লেনদেনের ব্যাপারে কোন কর্তৃত্ব নাই, তাই শেয়ারহোল্ডাররা স্বেচ্ছায় সুদ গ্রহণ করেছে এমন অপবাদ দেওয়া মুশকিল। বিশেষ করে যখন শেয়ারহোল্ডাররা সুদি লেনদেনের বিরুদ্ধে বোর্ড অব ডাইরেক্টরের কাছে প্রতিবাদ করবে। এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা চাইলেও সুদি লেনদেন থেকে বিরত থাকতে পারে না। তাই এক্ষেত্রেও শেয়ারহোল্ডারদের অনিচ্ছায় সুদ তাদের আয়ের মধ্যে আসতেছে। আর আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যার কথার উদ্দেশ্যও তাই। দ্বিতীয়ত তাওবাকারীদের ক্ষেত্রেই এই উসুল প্রযোজ্য হবে অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা। এমন কথা দলিলবিহীন দাবি যা কখনো গ্রহনযোগ্য হতে পারেনা।

দ্বিতীয় দলিলঃ

শরীয়তের একটি নীতি হলো যেসকল স্বল্প নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিবৃত্ত থাকা সম্ভব নয় অথবা নিবৃত্ত থাকা কষ্টসাধ্য সেটা ক্ষমাযোগ্য, মানুষের সমস্যাকে দূর করার জন্য। যেমন স্বল্প নাপাকি এবং সতরের স্বল্প অংশ খুলে গেলে তা ক্ষমাযোগ্য। হেদায়া কিতাবে আছে-

القليل لايمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع عنه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف

অন্য ভাষায় বলা হয়–

مالا يمكن الاحتراز منه فمعفوعنه

বর্তমানে অধিকাংশ কোম্পানির সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কারণ আইনগতভাবে একটি কোম্পানি চাইলেই সকল অর্থ নিজের থেকে দিয়ে কিংবা শেয়ার ছেড়ে সংগ্রহ করতে পারেনা।বরং কিছু অর্থ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। যদি ঋণ গ্রহণ না করে তাহলে সরকার বিভিন্ন সময়ে কোম্পানিকে কারণে অকারণে হয়রানি করে। তাই কোম্পানি অনেক অপারগ হয়েও ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ ব্যতীত কোম্পানি পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য। তাই কোম্পানি ব্যাংকের সাথে অপারগ হয়ে যে সুদি লেনদেন করে এবং তা যেহেতু কম হয়ে থাকে তাই এই উসুলের আলোকে তা ক্ষমাযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। (হেদায়া ব্যাখ্যাসহ খ:১ পৃ:২০৩, ৫২৮, আল মুনতাক্বা খ: ১ পৃ: ৬২ আল আসহুমুল মুখতালিতা পৃ:৯০২)

দ্বিতীয় দলিলে আপত্তিঃ

এই নীতিমালাটি আলোচনা করতে গিয়ে ওলামায়ে কেরাম এমন কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছেন যার থেকে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকা খুবই কষ্টসাধ্য। এধরণের বিষয় থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বাধ্য করলে মুসলমানের উপরে সমস্যা নেমে আসবে এবং সকল মানুষের সাথে লেনদেনের মধ্যে সংকটের সৃষ্টি হবে। কিন্তু শেয়ারের মধ্যে এধরণের কোন সংকট নেই। সকল ওলামায়ে কেরাম একমত স্বল্প নিষিদ্ধ জিনিস ক্ষমাযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে, যখন তার থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সুদি লেনদেনে জড়িত কোম্পানির শেয়ার থেকে বিরত থাকা মানুষের পক্ষে কোন অসম্ভব ও নয় এবং এতে কোন প্রকারের সংকট সৃষ্টি হবেনা। তাই এই নীতিমালার আলোকে শেয়ার বাজার কে জায়েজ বলার কোন সুযোগ নাই । কেননা শেয়ার বাজারে মানুষ বিনিয়োগ না করলে এমন কোন সংকট সৃষ্টি হবে না যা শরিয়তে ক্ষমাযোগ্য। (প্রাগুক্ত)

আপত্তির উত্তরঃ

শেয়ার বাজারে যদিও মানুষ বিনিয়োগ করতে বাধ্য নয়। কিন্তু কোম্পানি বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে অনেক সময় সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। কোম্পানি অনেক সময় না চাইলেও তাকে বিভিন্ন প্রকারের হয়রানি বিশেষ করে তার উপর সরকারের কু-দৃষ্টি এড়ানোর জন্য ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কেননা যদি কোম্পানি ঋণ গ্রহণ না করে, তাহলে সরকার কোম্পানির উপর মোটা অংকের আয়করের বোঝা চাপিয়ে দিবে। আর প্রচলিত আয়কর যে একটি শোষনমূলক ব্যবস্থা তা অধিকাংশ ফোক্বাহায়ে কেরাম মত দিয়েছেন। তাছাড়া তার উৎপাদন কাজ পরিচালনা করার জন্য তার কাছে অনেক সময় অর্থ থাকেনা এবং তাকে সুদ মুক্ত ঋণ দেওয়ার মত কেউ নাই তাই সে অনেক সময় নিরুপায় হয়ে ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যেহেতু কোম্পানির জন্য ক্ষেত্র বিশেষ সুদে ঋণ বৈধ হওয়ার অবকাশ আছে, তাই সেই আলোকে শেয়ার বাজারও জায়েজ হওয়ার অবকাশ আছে। বিশেষ করে যখন শেয়ারহোল্ডাররা সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

তৃতীয় দলিল:
শরিয়তের একটি নীতিমালা আছে যে, وللاكثر حكم الكل অর্থাৎ সংখ্যাধিক্যের পক্ষে সকল এককের বিধান প্রযোজ্য হয়। এই নীতিমালার আলোকে অনেক ওলামায়ে কেরাম বলেন, কোম্পানির অধিকাংশ কার্যক্রম যেহেতু বৈধ এবং সুদি কার্যক্রম বা অবৈধ কার্যক্রমের পরিমান যেহেতু কম তাই সংখ্যাধিক্যের আলোকে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় -বিক্রয় কে বৈধ মনে করা হবে। এই নীতির আলোকে অনেকে বলেন, কোম্পানির মূলধনের ৫০% এর মত যদি সুদি ঋণ বা হারাম উপাদান থাকে, তাহলে সেটাকে কম মনে করা হবে। আবার অনেকে বলেন, ওসিয়্যতের হাদিসের আলোকে কোম্পানির মূলধনের এক তৃতিয়াংশের কম যদি হারাম উপাদান থাকে তাহলে সেটাকে কম মনে করা হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) ওসিয়্যতের হাদিসে এক তৃতিয়াংশকে অধিক বলে অভিহিত করেছেন। যারা শেয়ার লেনদেনকে জায়েয মনে করেন তাদের অধিকাংশ এক তৃতিয়াংশের কম হওয়াকে অর্থাৎ ৩৩% এর কম সুদি কারবার হলে তাকে কম ধরেছেন এবং এসকল কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের পক্ষে মত দিয়েছেন।(আল আসহুমুল মুখতালিতা পৃ:৯২)

তৃতীয় দলিলে আপত্তি:
এই নীতিমালাটি ব্যাপক নয়। এর দ্বারা ফেতনা এবং হারামের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। বরং এই নীতিমালাগুলো দিয়ে দলিল পেশ করা যতার্থ হবে তখনই, যখন শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির তৎপরতায় অংশগ্রহণ না করে। তারা হবে কেবল এমন একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী যে কোম্পানির অধিকাংশ কার্যক্রম হালাল আর সামান্য কিছু কার্যক্রম হারাম। অথচ বাস্তবতা তা নয়, শেয়ারহোল্ডাররা কোন কোম্পানি থেকে পৃথক কোন সত্ত্বা নয় বরং তারাও কোম্পানির মধ্যে শরীক। আর তারা শরিক হয়েছে শিরকতে আকদের উপর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির মধ্যে, ওকালতের ভিত্তিতে যার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি এধরণের কোম্পানির গ্রাহক হবে এবং সে জানে কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টর কোম্পানির কিছু মাল যদিও সেটা খুবই কম হয় হারাম খাতে বিনিয়োগ করে তাহলে তাকেও এক্ষেত্রে পাকড়াও করা হবে।
যারা লেনদেন করে তাদের মধ্যেও কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেননা সে জেনে শুনেই লেনদেন করেছে এবং তাকে এধরণের কোম্পানির গ্রাহক হতে বাধ্য করা হয় নাই। সুতরাং যে সকল কোম্পানির মূল কার্যক্রম হালাল কিন্তু সামান্য পরিমানে তারা হারাম উপায়ে লেনদেন করে তাদের শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে নমনীয় ভাব পোষন করা কখনো সমীচীন নয়।(প্রাগুক্ত)

আপত্তির উত্তর:
কোম্পানিকে শিরকতে আকদের অন্তর্ভূক্ত মনে করার কারণে তাদের এই আপত্তি। অথচ কোম্পানি কোন শিরকতে আকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং কোম্পানি নিজেই একটি আইনগত সত্ত্বা। তার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। আর শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির একটি অংশের মালিক হয়েছে। আর কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করে বোর্ড অব ডাইরেক্টর। যারা শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে শিরকতে আকদের মত উকিল নয় এবং তাদের কোম্পানি পরিচালনা করার মধ্যে কোন কর্তৃত্ব নাই। তারা শুধুমাত্র কোম্পানির মুনাফা হলে মুনাফা পাওয়ার অধিকার রাখে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

|সু|খ|ব|র|

মহান আল্লাহ তা'আলার অপার মেহেরবানীতে দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধিমূলক সাময়িকী 'মাসিক আল-আবরার' প্রকাশনার ১বৎসর পেরিয়ে আপনাদের আস্থা-ভালবাসা ও আগ্রহ নিয়ে ২য় বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে আল-আবরার পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সংখ্যাকে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব, পীর মাশায়েখ ও কলামিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ লেখার সমন্বয়ে নতুন বর্ষ ও সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা হিসেবে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশের।

তাই ইসলামী মনীষী, ওলামায়েকেরাম, সাহিত্যিক, লেখক ও কলামিষ্টদের আন্তরিক আহবান যানাচ্ছে, আপনাদের মূল্যবান লেখা প্রেরণ ও দু'আ আমাদের মহতী উদ্যোগকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে সহায়ক হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মাসিক আল-আবরারের বিগত ১২ সংখ্যার ভলিয়ম আগামী ফেব্রুয়ারী ২০১৩ থেকে প্রকাশনা দপ্তর হতে সংগ্রহ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

কোয়ান্টাম মেথড-৯

বৌদ্ধ প্রীতির নমুনা

মুফতী শরীফুল আ'জম

যদিও কোয়ান্টাম সকল ধর্মের লোকদের আকৃষ্ট করতে প্রত্যেক ধর্মের কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে ধর্মের প্রতিচ্ছবি ও প্রভাব কোয়ান্টামে প্রস্ফুটিত হয় তা হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্ম। আবির্ভাব, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও ধ্যান ধারণার ব্যাপক মিল লক্ষ্য করা যায় এতদুভয়ের মাঝে।

প্রবর্তন:

বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর প্রবর্তক হলেন গৌতমবুদ্ধ। পিতা শুদ্ধোদন শ্যাক্যবংশের প্রধান বা রাজা ছিলেন। গৌতম রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বাল্যকাল থেকে তিনি চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দের এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তীথির গভীর রাতে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতম চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে সত্যান্বেষণে বের হন। প্রথমে তিনি তৎকালীন সুবিখ্যাত মুনি ও ঋষি আলারা ও পরবর্তিতে উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুক্তির পথ সন্ধান করেন। কিন্তু কারো কাছ থেকে দুঃখের রহস্য উদঘাটন তথা মুক্তির সন্ধান না পেয়ে পাঁচজন সন্ন্যাসীকে সাথে নিয়ে নির্জন জঙ্গলে কঠোর কৃচ্ছ সাধনে ছয় বৎসর তপস্যা চালান। কিন্তু তাতে নিষ্ফল হন। তখন গৌতম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মধ্যম পন্থায় সাধনার উদ্দেশ্যে গয়ার নিকটবর্তী উরবিল্ব নামক গ্রামে চলে আসেন। সেখানে নৈরাঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থবৃক্ষ তলে দুঃখের রহস্য সন্ধানে পূণরায় ধ্যানমগ্ন হন। অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ দিন পর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাত্রে তিনি বোধি বা চরম জ্ঞান লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধ মানব জীবন নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগত 'সব্বং দুঃখময়' অর্থাৎ জগত দুঃখময়। এই দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং দুঃখের কার্যকারণ ও প্রতিকারের সন্ধান পেয়েছিলেন।(ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৮১-৬৮৩)

এই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের ইতিহাস। কোয়ান্টাম মেথড প্রবর্তনের ইতিহাসও ঠিক একই ভাবে সাজানো হয়েছে। দুঃখের প্রতিকার করতেই কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম শেষে সন্ধান পাওয়া গেছে এই কোয়ান্টাম মেথডের। কোয়ান্টামের গুরুর কাছে করা এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্ন: আমরা জানি আপনি এক সময় সাংবাদিকতা করতেন। তারপর এস্ট্রলজি (রাশি চর্চা) করেছেন। সেসব ছেড়ে আপনি কেন কোয়ান্টামে এলেন?

উত্তর: আমি কেন কোয়ান্টামে? হ্যাঁ। এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন এবং এর উত্তর ও আমার কাছে সুস্পষ্ট। তবে উত্তর দেয়ার আগে একটু প্রেক্ষাপট বলা দরকার। প্রথমে বলি সাংবাদিকতায় কিভাবে এলাম? তারুণ্যে যখন মানুষের দুঃখ কষ্ট অভাব বঞ্চনা দেখেছি, মনে হয়েছিল এ দুঃখের কথা, কষ্টের কথা যদি লেখা যায় তাহলে কিছু একটা হবে। শুরু করলাম রিপোর্টারের কাজ।... কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বুঝলাম বাইরে থেকে যাই মনে হোক, একজন সাংবাদিকের স্বাধীনতা আসলে খুব সীমিত। তাকে লিখতে হয় পত্রিকার মালিকের ইচ্ছানুসারে, সত্য জানাতে চাইলেও জানানো যায় না। সিদ্ধান্ত নিলাম সাংবাদিকতা ছেড়ে দেবো। ...এস্ট্রলজির প্রতি আগ্রহ ছিলো। এই শখকেই পেশা হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।কারণ মনে হলো, একজন মানুষকে যদি ভালো পরামর্শ দেয়া যায়। একটা গাইডলাইন দেয়া যায় তাহলে তার দুঃখটাকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন বা তাকে যদি সতর্ক করে দেয়া যায়, তাহলে দুঃখ থেকে তিনি হয়তো দূরে থাকতে পারবেন।... তবে একজন এস্ট্রলজার হিসেবে আমার সীমাবদ্ধতা ছিলো।...দুঃখ বলতে পারছি, কিন্তু দুঃখের কোন সমাধান দিতে পারছিনা। প্রতিকার করতে পারছিনা। এই অতৃপ্তি ছিলো, দুঃখবোধ ছিলো। আর যেহেতু ধ্যান মেডিটেশনের সাথে তারুন্যেই পরিচয় ছিলো, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ...মেডিটেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে তার ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে বিপন্ন অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করা সম্ভব। বুঝলাম তার ভেতরের শক্তির জাগরণ ঘটিয়েই তার দুঃখকে আনন্দে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যার্থতাকে সাফল্যে, আর অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করা যাবে। যখন বুঝলাম তখন আর সময় নেইনি। যেভাবে সাংবাদিকতা ছেড়ে ছিলাম, তেমনি এস্ট্রলজি ছেড়ে কোয়ান্টামে নিজেকে সঁপে দিলাম। ...আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছি এখন।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/৪২৯-৩১)

বোঝাগেলো মানুষকে দুঃখ মুক্ত করতে প্রথমে সাংবাদিকতা তার পর জ্যোতিষী অবশেষে মেডিটেশনের পথ অবলম্বন করে কোয়ান্টাম মেথড উদ্ভাবন করা হয়। এই একই লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিলের

জন্য গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন।অথচ মানব মুক্তির পথ মানব বুদ্ধি বলে উদ্ভাবন সম্ভব নয়। মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে এত্তেবায়ে সুন্নাত তথা মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শের অনুসরণ। মনে প্রাণে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হলে মুক্তির জন্যে অন্য কোন মেথড বা জীবনদৃষ্টি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"(সুরা আল-আহযাব-২১)

বৌদ্ধ ধর্মে আল্লাহ তা'আলা বা শেষ দিবসের কোনো ধারণা নেই। তারা নাস্তিক এবং পরকালে অবিশ্বাসী। তাই তারা মুক্তি পেতে নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ ভিন্ন বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে। কিন্তু যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা সফলতা ও মুক্তির পথ হিসেবে নবীজীর আদর্শ অনুসরণ করবে না কি কোয়ান্টামের? চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত থেকে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে– "মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।" (সূরা আন্নুর-৫১) আলোচ্য আয়াতটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল, চল তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মিমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এজলাসে মুকাদ্দামা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবর্তে কা'আব ইবনে আশরাফ ইহুদীর কাছে মুকাদ্দামা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

অতএব, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ বাদে অন্য কোনো মেথড বা জীবন দৃষ্টির মাঝে সফলতা ও মুক্তির পথ খোঁজা মুমিনের কাজ হতে পারে না। মুমিন তো সর্বাবস্থায় তার সকল সমস্যার সমাধান নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত দ্বীনে ইসলামের মাঝে সন্ধান করবে।

মূল উৎস:

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগত ও জীবন সম্পর্কে যে নীতি, বিধানও মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই 'বৌদ্ধদর্শন' বা 'বৌদ্ধধর্ম'। বুদ্ধের উপদেশবাণী ও চিন্তাধারাই বৌদ্ধ দর্শনের উৎস ও ভিত্তি। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৮১)

ওহী বা ঐশী বাণীর সাথে এধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। একজন মানবের বিবেক প্রসূত সফলতার সূত্রসমূহ এখানে মেনে চলা হয়।

কোয়ান্টাম মেথডের অবস্থাও তাই। মহাজাতক কর্তৃক উদ্ভাবিত জীবনদৃষ্টি, চিন্তা-ধারা, উপদেশ ও বাণীসমূহই এই মেথডের উৎস ও ভিত্তি। নির্দিষ্ট কোনো ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ কোয়ান্টামে করা হয় না। বরং সকল ধর্মের নির্যাস নিজের বুদ্ধিতে আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের লেভেল লাগিয়ে চালানোর পন্থা গ্রহণ করা হয়। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস- ১৪৩)

পরকাল:

বুদ্ধের বাণী ও দর্শনসমূহ জগত ও জীবন কেন্দ্রিক ছিল, যেখানে জগতের দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। আখেরাত বা পরকালের কোন আলোচনা সেখানে নেই। পরকালের মুক্তি বা দুঃখ লাঘব কি করে হবে? তা ওই দর্শনে স্থান পায়নি।

কোয়ান্টাম মেথডের অবস্থাও তাই। "সাফল্যের চাবিকাঠী কোয়ান্টাম মেথড"বই এর কভারের শেষ পৃষ্ঠায় মহাজাতকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে;" জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য জীবন যাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথড এর উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক" ।অর্থাৎ এখানে শুধু জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের টেকনিক নিয়ে আলোচনা হয়। এখানে আখেরাতের ধ্যান-ধারণা বা সমস্যা সমাধানের কোন আলোচনা নেই। এক প্রবন্ধে মহাজাতক লিখেন "একটাই তো জীবন। সুখ সাফল্য আনন্দ খ্যাতি পার্থিব বা আত্মিক যা কিছু অর্জন তা তো এই এক জীবনেরই ফসল।" (কো.উ.-৬) আখেরাতের বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে একটাই তো জীবন এমন বক্তব্য দেয়ার কোন অবকাশ কি আছে? বরং পার্থিব এ জীবনের পর আখেরাতের আরেক জীবন সামনে রয়েছে আর সেটাই চিরস্থায়ী ও আসল জীবন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক বৈ তো কিছু নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত"।(সুরা আল- আনকাবুত–৬৪)

হ্যাঁ, অবিশ্বাসী তথা কাফেররা পরকাল বিশ্বাস করে না। তারা বলে, "আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা

পূনরুত্থিত হবো না।" (সূরা আল-মুমিনুন-৩৭) অর্থাৎ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই অংশ এবং পরকালের জীবন বলতে কোনো কথা নেই। কেয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের বিশ্বাসও তাই।

কোয়ান্টাম মেথডও মুক্ত বিশ্বাসের নামে বিভিন্ন কথা ও কাজের মাধ্যমে এই কুফরী বিশ্বাসই মুসলমানদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। কোয়ান্টামের মতে পার্থিব বা আত্মিক অর্জনের জন্যই এ জীবন, আখেরাতের জন্য নয়। অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?" (সূরা আল-মুলক-০২) হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ احسن عملا পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী যে আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত বিষয়াদী থেকে সর্বাধিক বেচে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উম্মুখ হয়ে থাকে। (কুরতুবী)

মোট কথা, বৌদ্ধ ধর্ম যেমন শুধু জগত ও জীবনের সমাধান দেয়, আখেরাত বাদ। অনুরূপ কোয়ান্টামও শুধু জাগতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধান দেয়, আখেরাত বাদ।

দুঃখের কারণঃ

বুদ্ধের দর্শন মতে জগতে দুঃখের কারণ মোট ১২ টি। তন্মধ্যে অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা বা আসক্তি উল্লেখযোগ্য। এই দ্বাদশ নিদানকে সংক্ষেপে লোভ, দ্বেষ ও মোহ রূপেও চিহ্নিত করা হয়। (ইস.আ.ভ্রা.-৬৮৪) কোয়ান্টামও এ ব্যাপারে একমত এবং ওই সকল পরিভাষাই হুবহু কোয়ান্টামে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অবিদ্যাঃ

যেমন অবিদ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে; "সকল ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর তথ্য, ধারণা, সংস্কার ও বিশ্বাসের নামই অবিদ্যা। আর এ অবিদ্যাই মানবজীবনের অশান্তির মূল কারণ।" (কো. কণিকা-১৬)

"লালসা কামনা বাসনা আসক্তি লোভ দ্বেষ মোহের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা।... সকল অশান্তির মূল যেমন অবিদ্যা, সকল অকল্যাণের মূলও অবিদ্যা।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/২৮৪)

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর তথ্য বা ধারণার সংজ্ঞা ঠিক করার মাপকাঠি কি হবে? বুদ্ধের দর্শন, কোয়ান্টাম মেথড নাকি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ? যেমন ধরুন; ইসলাম গান-বাদ্য ও পর্দাহীনতাকে হারাম বলে। আর কোয়ান্টাম তাদের মিউজিক ও বেপর্দা নারী-পুরুষের মেলাকে হালাল বলে। এগুলো তাদের মতে অবিদ্যা নয়। (হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/৫১,১/২৯০) এখন কার কথা সঠিক? কোয়ান্টিয়ার ভায়েরা উত্তর দিন।

সংস্কারঃ

বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুঃখের অন্যতম কার্যকারণ 'সংস্কার' প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম বলে– "ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খলমুক্তির পথ মেডিটেশন"। এবং "ভ্রান্ত ধারনা ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত বিশ্বাসে উপনীত হওয়াটাই হচ্ছে মানুষের আসল স্বাধীনতা।"(কোয়ান্টাম কণিকা-১৫-১৬)

আসক্তিঃ

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণে নির্ধারিত দুঃখের অন্যতম কার্যকারণ 'তৃষ্ণা' বা 'আসক্তি' প্রসঙ্গে কোয়ান্টামের অভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে- "চাওয়া যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন সেটা আসক্তি। দুঃখের প্রধান কারণ এই আসক্তি।" (কোয়ান্টাম কণিকা ১৮, হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০৯)

উত্তরণের পথঃ

বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুঃখের যে ১২ টি কারণ রয়েছে এগুলো হচ্ছে দুঃখের একেকটি শৃঙ্খল। এসকল শৃঙ্খল গুলো ছিন্ন করতে পারলেই দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আর ছিন্ন করার পদ্ধতিই হলো বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম দর্শনের মূল শিক্ষা। যার সারকথা হলো শৃঙ্খলা। অর্থাৎ দুঃখের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে শৃঙ্খলা। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ.-৬৮৩-৬৮৪)

কোয়ান্টামের বিভিন্ন বই পুস্তকেও একথা বারবার আলোচিত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খল মুক্তির নানান কৌশল নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। কোয়ান্টামের কয়েকটি সূত্র এখানে তুলে ধরা হলো। "শৃঙ্খলাই শৃঙ্খল মুক্তির পথ"।"বিশ্বাস শৃঙ্খল মুক্ত করে আর গোঁড়ামী শৃঙ্খলিত করে"।"কাম শৃঙ্খলিত করে আর প্রেম জীবনকে শৃঙ্খল মুক্ত করে"। "মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কেউ তার শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারে"। "ভ্রান্তধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খল মুক্তির পথ মেডিটেশন।" (কোয়ান্টাম কনিকা-১৬)

বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনার মাধ্যমে এই শৃঙ্খলা আয়ত্ব করতে পারলেই শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করা যাবে। অনুরূপ কোয়ান্টাম ও মেডিটেশনকে শৃঙ্খল মুক্তির সাধনা নির্বাচন করেছে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই দুঃখ জয় ও সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

নির্বাণ লাভ :

বুদ্ধের উদ্ভাবিত ধর্ম দর্শনে নির্বাণ তথা অস্তিত্ব হতে মুক্তি লাভ করাই হচ্ছে একজন ধার্মিক মানুষের মূল চাওয়া-পাওয়া। তাদের সকল সাধনা আরাধনা মূলত এই নির্বাণের উদ্দেশ্যে

হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু, জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কোন কথা নেই। আছে নির্বাণ লাভ অথবা পূণরপূণর জন্মলাভ করে জগতের দুঃখে নিপতিত হওয়া। তাই যে ভালো কাজ করবে সে দুনিয়ায় পূণর্জন্ম গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে এবং নির্বাণ লাভ করবে। আর অসৎ কাজ করলে এ দুনিয়ায় পূণর্জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে জগতের দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হবে। নির্বাণ বলতে বৌদ্ধরা মূলত পূণর্জন্মের নিরোধ হওয়া, তৃষ্ণা,ক্ষয়, রাগ,দ্বেষ ও মোহ এবং সর্বপ্রকার বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করাকে বোঝায়। নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা, যা সব উপাধি বর্জিত ও সর্ব সংস্কার মুক্ত। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৫৮)

কোয়ান্টামও এই একই দর্শনের প্রচারণা চালাচ্ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাষাটা কিছু কিছু পরিবর্তন করে নির্বাণ লাভের প্রক্রিয়া রপ্ত করার প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। জান্নাত লাভ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে এখানে কোন আলোচনা নেই। নির্বাণ বলতে বৌদ্ধরা যা বোঝায় কোয়ান্টামের ব্যাখ্যাও তাই, শুধু ভাষাটা আলাদা। নির্বাণ শব্দের স্থলে তারা 'স্বাধীনতা', 'প্রকৃতির সাথে একাত্মতা', 'নিজেকে লীন করা' কিংবা 'মহাচেতনায় মিশে যাওয়া' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। যেমন বলা হয়েছে– "ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত বিশ্বাসে উপণীত হওয়াটাই হচেছ মানুষের আসল স্বাধীনতা।"(কোয়ান্টাম কনিকা-১৬) আসল স্বাধীনতা তথা নির্বান লাভ, যা ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের মত দুঃখের শৃঙ্খল হতে মুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। কোয়ান্টামের সাধনার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচেছ এই স্বাধীনতা, মহাচেতনায় মিশে যাওয়া, প্রকৃতির সাথে এক হয়ে নিজের অস্তিত্বকে লীন করা। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হচেছ। শিথিলায়নের (ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি) অনুশীলনের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে– "অনুভব করুন দেহের জৈব কোষগুলো আর জৈব কোষ নেই, পরিনত হয়েছে বালু কণায়। অনুভব করুন আপনার সারা দেহ এখন বালু কণায় পরিণত হয়েছে। এবার অনুভব ও অবলোকন করুন আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করেছে। আঙ্গুল, হাত,পা, বুক, পেট, উরু, সব বালুর মত ঝড়ে ঝড়ে পড়ে যাচ্ছে। আপনি পরিণত হচেছন এক বালুর স্তুপে। এখন আপনি অনুভব করুন উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে।বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস ঝড়ের রূপ নিচ্ছে আর ঝড় আপনার শরীরে অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে বালু কণাগুলো রয়েছে তা উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন। আপনি এখন পরিপূর্ণ শিথিল।" (সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড -৫৯)

নির্বাণের এই অনুশীলনের নাম কোয়ান্টাম রেখেছে শিথিলায়ন। নির্বাণ আর শিথিল হওয়াটা যেন একই অনুভুতির নাম। যেখানে দেহের অস্তিত্ব প্রকৃতির সাথে মিশে লিন হয়ে যাবে আর রবে শুধু চেতনাও মন।

এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম ধ্যানের প্রাথমিক অনুভুতি, এর চেয়ে আরো গভীর স্তরের ধ্যান হচেছ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার মেডিটেশন। যেখানে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় নিজের চেতনাকে লীন করে, এ্যলোমিনিয়াম, তামা, পিতল, ইস্পাত, চুম্বক, সীসা, রাবার ইত্যাদি ধাতুর দেয়াল ভেদ করার কল্পনা করা হয়। বিভিন্ন লতা-পাতা, ফল, ফুল, গাছ-পালা, গ্রহ-তারা, সাত সমুদ্র ও প্রকৃতিক দৃশ্যের মাঝে নিজেকে মিটিয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার অনুশীলন করানো হয়। অবশেষে একথা কল্পনা করতে বলা হয়। "আপনি এবার পরিপূর্ণভাবে অনুভব করুন, আপনি যত ক্ষুদ্রই হোন, এখন প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। আপনি প্রকৃতির শক্তির সাথে একীভূত হয়েছেন। আপনার চেতনা মিশেগেছে মহাচেতনার সাথে। তাই আপনার যে কোনো সমস্যাই থাকনা কেন, তা এখন আর আপনার সমস্যা নয়, পরিণত হয়েছে প্রকৃতির সমস্যায়।আর তা সমাধানের দায়িত্ব শুধু আপনার চেতনার উপরই বর্তায় না, বর্তায় মহাচেতনার উপর। আপনি মহাচেতনার হাতে ফলাফলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে নিজের কাজ করে যান। কাজের ফলাফল ও সাফল্যে আপনি চমৎকৃত হবেন।" (কোয়ামন্টাম মেথড ১৯৭-২০০)

অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মিশে একাত্ম হতে পারলে সব সমস্যার সমাধান প্রকৃতিই করে দিবে। (নাউযুবিল্লাহ) বৌদ্ধ ধর্মের নির্বান লাভের বাস্তবতাও তাই। নির্বান লাভ করে অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হতে পারলে প্রকৃতির সাথে মিশে একাকার হতে পারলে সকল দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, বান্দা ফরজ এবাদতের পর নফল এবাদত বন্দেগী করতে করতে আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য লাভ করে যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার থাকে না আল্লাহর হয়ে যায়। অর্থাৎ সে ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছে যায়। তখন তার সকল ইচ্ছা আল্লাহর অধিনে পরিচালিত হতে থাকে। আর তার সকল চাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে পূরণ হতে থাকে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫০১)

কোয়ান্টাম হাদীস নির্দেশিত ফানা

ফিল্লাহর পরিবর্তে প্রকৃতির মাঝে ফানা হয়ে যাওয়ার অনুশীলন করাচ্ছে। আর মানুষকে প্রকৃতির অধিনে সঁপে দিচ্ছে। সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে পাওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির কাছ থেকে কামনা করছে। এধরণের মেডিটেশনের অনুশীলন শিরক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে কি?

একটি বিভ্রান্তির জবাবঃ

প্রকৃতি পূজার পক্ষে সাফাই গেয়ে কোয়ান্টাম প্রশ্ন-উত্তর আকারে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে।

প্রশ্নঃ প্রকৃতির সাথে একাত্মতা মেডিটেশনে বলা হয় যে, এখন থেকে কোন সমস্যাই আপনার সমস্যা নয়। এখন প্রকৃতিই আপনার সমস্যা সমাধান করবে। কিন্তু সকল সমস্যা সমাধান তো করবেন আল্লাহ। প্রকৃতি কীভাবে আমার সমস্যা সমাধান করবে?

উত্তরঃ এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন। আমরা এখানে যে প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দনের কথা বলছি তা একটু বোঝার চেষ্টা করি। আসলে প্রকৃতি কার সৃষ্টি? কে চালান প্রকৃতি? উত্তর হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তিনি প্রকৃতি যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন প্রাকৃতিক নিয়ম, যে নিয়মে প্রতিটি কাজ সম্পাদিত হয়। (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/২২৩)

কোয়ান্টামের এই উত্তরটা খোঁড়া যুক্তি ও শিরকের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। উত্তরের সার কথা হলো প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ পাক এবং এর মাধ্যমে মানুষের সমস্যা সমাধান করা আল্লাহর নিয়ম। তাই প্রকৃতির কাছে সমস্যার সমাধান কামনা বৈধ। অথচ সাধারণ বিবেকের কথা হলো প্রকৃতি নিজেই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি তাই সকলের স্রষ্টা মহান আল্লাহর কাছে চাইলেই তো হয়, প্রকৃতির কাছে চাওয়ার কি প্রয়োজন? রাজা তার কার্যাদী উজির-নাযিরের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন এটাই সাধারণ নিয়ম। তাই বলে কি রাজার পরিবর্তে উজিরের বরাবর দরখাস্ত লিখা, উজিরের কাছে নিজেকে সমর্পন করা বৈধ হবে? এটাকেই বলে শিরক। মুশরিকগণ সকলেই আল্লাহ পাকের উপর ঈমান রাখে তাকে স্রষ্টা মনে করে, কিন্তু তার সাথে অন্যান্যদের শরীক সাব্যস্ত করে তাদের পূজা করে বলে তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়। তদ্রুপ প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ পাক একথা বলে আবার সেই সৃষ্ট বস্তুর কাছে সমস্যা সমাধান কামনা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। সমস্যা সমাধান তো করবেন একমাত্র আল্লাহ পাক, চাই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী করুন বা ব্যতিক্রম কোন পন্থায়। তাই সমাধান কামনা করতে হবে একমাত্র তাঁরই কাছে। গাছ-পালা, লতা-পাতা বা কোন ধরণের মাখলুকের কাছে সমাধান কামনা ও তার সাথে একাত্ম হওয়ার মেডিটেশন নিঃসন্দেহে শিরক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "তিনিই সে মহান আল্লাহ যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-বাক্বারা-২৯) অর্থাৎ কুল মাখলুকাত মানুষের সেবক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। আর মানুষদের নিয়োজিত করা হয়েছে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। এসকল সেবকের সেবা গ্রহণ করে স্রষ্টার সকল হুকুম-আহকাম পালন করার মাধ্যমে আখেরাতের তৈয়ারী করাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে তাঁর সকল বিধি-বিধানের সামনে নিজেকে সঁপে দেয়াই হচ্ছে মানুষের আসল সফলতা। তাই প্রকৃতির মাঝে নিজেকে লীন না করে প্রকৃতির স্রষ্টার মাঝে নিজেকে লীন করতে হবে। এর বিপরীত প্রকৃতির সাথে একাত্মের অনুশীলন অপাত্রে কৃতজ্ঞতার সমতুল্য। যেমন, কেউ যদি মানি অর্ডার পেয়ে ডাক পিয়নের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, তার গুণ কীর্তনে মুখর হয় আর টাকা প্রেরকের কথা ভুলে যায় তবে সে কৃতঘ্ন হিসেবে গণ্য হবে। অনুরুপ প্রকৃতির স্রষ্টার কথা ভুলে গিয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সকল সমস্যার সমাধান প্রকৃতির কাছে কামনা করাও আল্লাহর নাফরমানী হিসেবে ধর্তব্য হবে। অতএব আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সকল সমস্যা প্রকৃতির মাধ্যমে সমাধান করার অনুশীলন করতে পারে না। বৌদ্ধরা যেহেতু আল্লাহ ও আখেরাতের বিশ্বাসী নয় তাই তারাই প্রকৃতি পূজার এ পদ্ধতী উদ্ভাবন করে ও এর অনুশীলন করে থাকে। মুমিন মুসলমান হতে হলে সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে হওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে, কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাস অনুসারে প্রকৃতির কাছ থেকে নয়।

মোট কথা, বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে দুঃখ জয় করা। দুঃখের কারণসমূহের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তি লাভ করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তাদের ধর্মের সকল সাধনা-আরাধনা প্রবর্তিত হয়েছে ও চর্চিত হয়ে আসছে। কোয়ান্টাম মেথড ও সেই একই পথে হেটে চলছে শুধু ভাষাটা আধুনিক। এবং দুঃখ জয়ের জন্যে শৃঙ্খল ভঙ্গের বিভিন্ন টেকনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। যেহেতু বর্তমান যুগটা বিজ্ঞানের যুগ বলে প্রসিদ্ধ তাই কোয়ান্টাম বৌদ্ধ ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সজ্জিত করে কিছুটা চমক সৃষ্টি করে নিজেকে এর উদ্ভাবক হিসেবে জাহির করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে কোয়ান্টামকে বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক মডেল বলে মনে হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। ঈমান বিধ্বংসী এই মেথড থেকে আল্লাহ পাক সকলকে রক্ষা করুন।

যা রেখে গেলেন মুফতী আমিনী (রহ.)

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

জীবন যেভাবে যাপন করবে মৃত্যুও তোমাদের সেভাবেই হবে। যেভাবে মৃত্যুবরণ করবে শেষ বিচারের দিন সে অবস্থায়ই উঠবে। জীবন-মৃত্যুর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন একটা ইশারা রয়েছে। মুফতী মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ১১ ডিসেম্বর ২০১২ মঙ্গলবার দিনভর তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্ম করেছেন। ইবাদত-বন্দেগী, খাওয়া দাওয়া, শিক্ষকতা ও ইমামতিসহ সংগঠন, রাজনীতি, বৈঠক, বিবৃতিদান সবই করেছেন। রাতের মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত লালবাগের ছাত্রদের বুখারী শরীফ পাঠদান করেছেন। একবার বলেছিলেন, শরীর খারাপ লাগছে। ১১টার দিকে বেশি খারাপ লাগায় হাসপাতালে যান। সেখানেই রাত সোয়া বারটার দিকে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তারিখটা পড়ে যায় ১২ ডিসেম্বর। বহুল আলোচিত ১২-১২-১২ তারিখ মুফতী আমীনী চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তিনি ডায়াবেটিসের রোগী ছিলেন। ক'বছর আগে একবার তাঁর ব্রেইন ষ্ট্রোকও হয়ে গিয়েছিল। মানসিক চাপে তো ছিলেনই। শারীরিকভাবেও দুর্বলতা তাঁর বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ২০ মাসেরও বেশি সময় ধরে গৃহ বন্দিত্বের ফলে তিনি প্রাণশক্তি অনেকটাই খুইয়ে ফেলেছিলেন। ভাবনা ও তৎপরতায় বাধা পেলে মানুষ যেমন দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তিনিও গত ৪ বছর নানা ধকল সইতে গিয়ে অনেকটা নির্জীব ভাব নিয়ে মনে হয় অকাল মৃত্যুকেই বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। জাতীয় ঈদগাহে ১২ তারিখ তাঁর জানাজাপূর্ব সমাবেশে তাঁর পরিবারের লোকজন ছাড়াও একাধিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা বলেছেন, মুফতী আমিনী (রহ.) এর মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলা যায় না। তিনি বন্দিদশায় মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে অসময়ে চলে গিয়েছেন। সত্যের সংগ্রামে তাঁর নিছক মৃত্যু হয়নি বরং তিনি শহীদী মর্যাদা লাভ করেছেন ইত্যাদি।

تموتون كما تحيون و تحشرون كما تموتون

অর্থাৎ মৃত্যু তোমার সেভাবেই হবে, জীবন যেভাবে করবে যাপন, হাশর তোমার সেভাবেই হবে, মরন যেভাবে করবে বরণ। কথাটি যদি সত্য হয় তাহলে মুফতী আমিনী সাহেবের মৃত্যু ও জানাযা যেমন ঈর্ষণীয় তাঁর পরকালীন অবস্থাও তেমনি হওয়াই স্বাভাবিক।

মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। কোরআন সুন্নাহ উসুলে ফিকাহ, ইতিহাস, দর্শন ও সাধারণ জ্ঞানের ওপর তাঁর পড়াশোনা, গবেষণা ও চর্চা ছিল অসাধারণ। ছাত্রজীবনে ষ্ট্রিট লাইট বা মসজিদের বাইরের বাতির আলোয় বসে সারারাত বই পড়ার কথা তাঁর সমসাময়িকদের মুখ থেকে শোনা যায়। পরিণত বয়সেও তিনি পাঠাভ্যাস ধরে রেখেছিলেন। কখনো দেখা হলে ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন নিয়ে কিছুটা হলেও মতবিনিময় হত। শহীদে কারবালা বিষয়ে তাঁর একটি সুলিখিত বই, একাধিক খ- তাঁর ফতওয়া সংকলন, দীনে এলাহী, অসৎ আলেম ও পীর শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর নিবন্ধ থেকে তাঁর ভাবনা ও চেতনার ধরন বোঝা যায়।

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমিনপুরে জন্ম নেয়া এ মনীষী মূলত ঢাকার লালবাগ মাদরাসায়ই পড়াশোনা করেন। পরে করাচি বিন্নোরি টাউন থেকে উচ্চতর হাদীস ও ফিকাহ পাঠ সমাপ্ত করেন। মুফতী মাওলানা ফজলুল হক আমিনী (রহ.) শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, এক সময় লালবাগ ও বড়কাটারা মাদরাসা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই তিনি এ দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর জামাতা এবং দুই পুত্র ও চার কন্যার জনক। লালবাগ শাহী মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মুফতী আমিনী (রহ.) ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত উদার, মহৎ, সদালাপি ও অতিথিবৎসল। তাঁর সরল সহজ চলাফেরা ও প্রাণখোলা কথাবার্তা মানুষকে কাছে টানত। তাঁর আচরণে মানুষ খুব দ্রুত তাঁর আপন হয়ে যেত। আল্লাহর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক এবং আল্লাহওয়ালাদের কর্মপন্থা গ্রহণে অকৃত্রিম সাধনা ছিল তার শক্তি ও সাহসের উৎস। তাঁর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে মনে হবে যে, তিনি একাই একটি জোট বা বড় দল ছিলেন। কারণ, তিনি এমন কিছু ইস্যু নিয়ে কথা বলতেন, যা হতো বাংলাদেশের দলকানা লোকজন আর গুটিকয়েক নাস্তিক মুরতাদ ছাড়া দল মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের কমন ইস্যু। যারা তাঁর দল বা সংগঠন না করলেও ধর্ম, নৈতিকতা বা জাতীয় স্বার্থে আমিনী সাহেব (রহ.)কে সমর্থন করত। অন্যায়, অশ্লীলতা, দুর্নীতি, অপশাসন ও ধর্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানকে পছন্দ করত। তাঁর সত্য উচ্চারণ, নির্ভীক কণ্ঠস্বর ও দুঃসাহসিক অবস্থান বহু মানুষকে উজ্জীবিত করত। ১২ ডিসেম্বর আমিনী সাহেব (রহ.) এর জানাযায় লাখো মানুষের ঢল প্রমাণ করেছে যে, তিনি কত জনপ্রিয় ছিলেন। দেশের ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের উপর তার

কতটুকু প্রভাব ছিল। আমরা যারা তাঁর সংগঠনে ছিলাম না, তাঁরাও কোন না কোন সুবাদে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম। তাঁর বিরোধীরাও এ প্রভাবের বাইরে ছিলেন না।

জাতীয় ঈদগাহ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে, মৎস্য ভবন, পল্টন, প্রেসক্লাব ও সচিবালয় পর্যন্ত মানুষের ভিড়। নামাযের জন্য যতটুকু ফাঁকা রাখা হয় ততটুকু ফাঁকা না রেখেই দাঁড়িয়েছিল অধিকাংশ কাতার। বেলা দেড়টা থেকে নামাযিরা আসতে থাকেন ঈদগায়। সাড়ে তিনটা পর্যন্ত লোকজন কেবল আসতেই থাকে। ধারণা করা হয়, মুফতী আমিনী (রহ.) এর জানাযায় অন্তত পাঁচ লাখ লোক শরিক হন। রাজধানী ও আশপাশের এলাকা শুধু নয় দেশের দূর দূরান্তের জেলাগুলো থেকেও তাঁর সহকর্মী, বন্ধু, ছাত্র, ভক্ত ও সমর্থকরা জানাযায় যোগ দেন। সাংগঠনিক যোগসূত্র ছিল না অথচ তাঁকে ভালবাসতেন, এমন মানুষই ছিলেন বেশি। মাওলানা আমিনী (রহ.) চারদলীয় জোট, বর্তমানে ১৮ দলীয় জোটের লোক হওয়ায় জানাযাপূর্ব সমাবেশে বিএনপি ও জোট নেতৃবৃন্দ অধিকহারে বক্তব্য রাখেন। ইসলামী এবং সমমনা অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী, সিলেট থেকে আগত নেতারাও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ঢাকাসহ সারাদেশের অসংখ্য আলেম উলামা পীর মাশায়েখ উপস্থিত থেকেও কোন বক্তব্য রাখেননি। একেতো সময়াভাব। দ্বিতীয়ত আমিনী সাহেব (রহ.) এর রাজনৈতিক প্লাটফরম ১৮ দলীয় জোটের নেতাদের ব্যাপক উপস্থিতি। যা আমিনী সাহেব (রহ.)এর বহুবিধ কাজ ও তৎপরতার অন্যতম। কিন্তু তাঁর মূল এবং পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়। মাওলানা ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ঢাকার লালবাগ ও বড়কাটারা মাদরাসার প্রিন্সিপাল। তিনি আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.), পীরজী হুজুর (রহ.), হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) এর স্থলাভিষিক্ত ধর্মীয় অভিভাবক। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান। ইসলামী মোর্চা ও উলামা কমিটির আমীর। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর সংগ্রামী আলেমসুলভ ভূমিকা। শরীয়তের প্রশ্নে তার আপোষহীন অবস্থান। কুরআনের বিধান পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনপণ আন্দোলন। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তসলিমা বিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁকে ব্যাপকভাবে চিনতে শুরু করে। ফতওয়া বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে তাঁর বিপ্লবী ভূমিকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয় শহীদের রক্তের বিনিময়ে চার দলীয় জোটের সরকার গঠন মুফতী আমিনী (রহ.)কে রাজনৈতিক অঙ্গনে পাকাপোক্ত আসন করে দেয়। কিন্তু মুফতী আমিনী (রহ.) শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই ছিলেন দ্বীন ও শরীয়তের জন্য নিবেদিত। ইসলাম ও মুসলিম জনতার স্বার্থ ছিল তাঁর রাজনীতির মূল ভাবনা। বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়ার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই ছিল তাঁর জীবন সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। যারা মুফতী আমিনী (রহ.)কে তাঁর আংশিক পরিচয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা এখানেই মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। মাওলানা ফজলুল হক আমিনী (রহ.) কি কেবল একজন সংসদ সদস্য ছিলেন? তিনি কি জোটের একজন নেতা মাত্র? এমপি মন্ত্রী তো এ দেশে নতুন পুরনো মিলিয়ে শত শত আছেন। রাজনৈতিক নেতা আছেন হাজারে হাজার। দেশবাসীর উপর তাদের কারো প্রভাব কি আমিনী সাহেবের মত? ১৮ দলীয় জোটের কোন নেতা, এমপি, মন্ত্রী কি এমন আছেন যার জানাযায় ২/৪ লাখ আলেম, উলামা, ইমাম, জানাযা জানা এবং ওজু গোসল করা নামাযি লোক সমবেত হবেন। পরহেজগার, পাক পবিত্র লোকজন বাদই দিলাম রাজনৈতিক জানাযা আদায়কারী পাঁচ মিশালী ২/৪ লাখ লোকও কি তাদের বিদায় জানাতে আসবে বলে মনে হয়। নাস্তিক, মুরতাদ, বামদের কথা আর নাইবা বললাম। জনবিচ্ছিন্ন এসব নেতাদের, দশ পনের জন একদিনে মরলেও শায়খুল হাদীস ও আমিনী সাহেবের সমান বড় জানাযা পাবেন বলে মনে হয় না। ধর্ম, ধর্মপ্রাণ মানুষ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতি তাদের ক্ষোভের এটিও একটি কারণ। প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার নামে সারা জীবন খোদাদ্রোহিতা ও ধর্মবিদ্বেষ চর্চা করে তাদের বড় বড় ব্যক্তিরা যখন মারা যান, তখন প্রশস্ত মাঠে জানাযার জন্য আনাই হয়না তাদের। সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মরদেহ রাখা হলে দেখা যায় ২/৪'শ বা হাজার মানুষের 'ঢল'। সপক্ষ মিডিয়ায় 'জনতার এ ঢলেরই' প্রচার দেয়া হয় বিশাল আকারে। অপর দিকে ইসলাম সম্পৃক্ত কোন বিষয় বা ব্যক্তি হলে চিহ্নিত মিডিয়া নীরব। বছরব্যাপী ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে যাওয়া হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি, অংশগ্রহণ, অনুভব, আকুতি। এ এক নিরন্তর ষড়যন্ত্র। অব্যাহত অন্যায় আর অসততা, বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের বোধ-বিবেচনায় এসব অপকর্ম আঁকা হয়ে থাকছে। অন্যায় ও অসততার সাধক ও লালনকারীরা প্রকৃতির নিয়মেই যথাসময় তার ফলাফল দেখতে পাবেন। কেন জানি আমার বারবার মনে হচ্ছিল আমিনী সাহেব (রহ.)এর জানাযায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন নেতা, মন্ত্রী অথবা গুরুত্বপূর্ণ এমপি শরিক হবেন। যেমন গত রমাজান মাসে শায়খুল হাদীস (রহ.)এর জানাযায় তাঁরা এসেছিলেন, বক্তব্যও রেখেছিলেন। কারণ, আমিনী সাহেব (রহ.) ১৮ দলীয় জোটের একার নন। তিনি দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের জনপ্রিয় কণ্ঠস্বর।

ধর্মপ্রাণ মানুষ মহাজোটেও আছেন। শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাদেরও আছে। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত তারাও পছন্দ করেন না। রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে এমন অনেক ইস্যু আমিনী সাহেব (রহ.) সংগ্রামী জীবনে এসেছে যার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীনেত্রী এক। সেসব ঈমান আকিদা ও ইসলামী আইন বিষয়ক ইস্যুতে তো রাজনীতি চলে না। প্রভাবশালী, জনপ্রিয় সাহসী, এ নেতার মনোভাব নিয়ে ঠা-ামাথায় কেউ ভেবেছেন বলে তো মনে হয় না। বিষয়টি নির্মোহ দৃষ্টিতে, উদারভাবে দেখলে সরকারের কর্মপন্থা তার প্রতি অন্যরকমও হতে পারত। প্রায় ২১ মাস তাকে গৃহবন্দীর মত আটকে রেখে, দেশব্যাপী চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে সরকার কতটুকু লাভবান হয়েছে কিংবা এ যাবত কী পরিমাণ মুনাফা তারা ভবিষ্যতে ঘরে তুলতে পারবে তা প্রশ্ন হয়েই রয়ে যাবে। জানাযায় অংশ না নিয়ে সরকারি পক্ষ আমিনী-প্রভাবিত জনমত থেকে স্পষ্টত বঞ্চিত হয়েছে। যা মহাজোটের বড় একটি রাজনৈতিক ক্ষতি এবং আপাতত অপূরণীয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে, এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠারও বহু আগে ৪ দলীয় জোট ভাঙার যতগুলো প্রয়াস চলে এর প্রতিটিই ব্যর্থ হয় সংশ্লিষ্টদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব এবং বিষয় বিশ্লেষণে ব্যাপক অক্ষমতার জন্য। সে সময়টি আমিনী সাহেব (রহ.)কে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক কৌশলে, অনেক কষ্টে। এরপর গত ১১ তারিখ তাঁর মৃত্যু পর্যন্তই তিনি ছিলেন বিদ্বেষ, অপপ্রচার, প্রতিহিংসা ও রোষের শিকার। মহাজোট সরকারের বিগত প্রায় চারবছর অহেতুক মুফতী আমিনী (রহ.) কে নানাভাবে টার্গেট করা হয়েছে। যার কোন প্রয়োজনই বর্তমান সরকারের ছিল না। কারণ, আমি শুরু থেকেই বলতে চেষ্টা করেছি যে, আমিনী সাহেব (রহ.) বিরোধী জোটের অন্য সকলের মত একজন রাজনীতিকমাত্র ছিলেন না। তাঁর কোন বিশাল সংগঠন ছিল না। তিনি পদ-পদবী, ক্ষমতা ও পার্থিব সম্পদের প্রতি লালায়িত কোন সাধারণ নেতা ছিলেন না। তিনি একটি আদর্শের জন্য জীবনপাত করতেন। তিনি আমৃত্যু ইসলামী আইন বাস্তবায়নের স্বপ্নলালন করতেন। তিনি শরীয়ত ও সুন্নাহ প্রয়োগের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর রাজনীতি, তাঁর জোটবদ্ধতা তাঁর প্রজ্ঞা কৌশল সবই নিবেদিত ইসলাম ও মুসলমানের জন্য। আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম) মনোনীত জীবনব্যবস্থার জন্য। তিনি তাঁর মূল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উপযোগী রাজনীতি বেছে নিয়েছেন। তার আলোচনার দুয়ার সবসময়ই খোলা ছিল সব রাজনীতিকের জন্য। কিন্তু মুফতী আমিনী (রহ.)এর ভাবধারা ধরতে না পেরে স্থূলচিন্তার নেতারা সবসময়ই কেবল ভুল করে গেছেন। অথচ মুফতী আমিনীর মত একজন উচ্চশিক্ষিত প্রজ্ঞাবান ও মেধাবী নেতাকে খুব স্বার্থকভাবে নিজের জনপ্রিয়তার সপক্ষে কাজে লাগাতে পারতেন প্রধানমন্ত্রী। তাকে বিরোধী অবস্থানে রেখেই এবং সম্মানিত বিরোধী ব্যক্তিরূপেই। কেবল প্রয়োজন ছিল আমিনী (রহ.)এর প্রভাব, চিন্তা, অনুসারী ও সমর্থকদের বিষয়ে গভীরভাবে জানা এবং ইতিবাচক ব্যবহারের। বিরোধী দলীয় নেত্রী দীর্ঘসময় কাছে পেয়েও মুফতী আমিনী (রহ.)কে কাজে লাগাতে পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। এমন না হলে হয়ত তাঁর রাজনীতি আজ এমন দুরবস্থায় এসে পৌঁছত না। মৃত্যুর পর তিনি আমিনীর কবর জিয়ারত করছেন। তার বাসভবনে হাজির হয়ে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছেন। কিন্তু জীবদ্দশায় আমিনীকে কোন পদ, সম্মান কিংবা সহায়তা দেননি। দেশের বড় দুই নেত্রীই মুফতী আমিনীর দ্বারা উপকৃত ও সমৃদ্ধ হতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা এ ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে মুফতী সাহেবের হাতেগড়া নেতৃত্ব যদি ধৈর্য, গঠনমূলক কৌশল ও সাধনার পথ ধরে এগিয়ে যায়, তাহলে আদর্শের সংগ্রাম শতগুণ ব্যাপ্তি ও শক্তি অর্জন করবে। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের স্বপ্ন যেমন অমর, এর তৃণস্পর্শী আন্দোলনও হবে চির অক্ষয়। দল, সংগঠন, জনশক্তি, বাহ্যিক শক্তি প্রদর্শন, অর্থবিত্ত ইত্যাদি কিছু দিয়েই যার গভীরতা মাপা যায় না। দেহে লুক্কায়িত প্রাণশক্তির মতই অদৃশ্য এ শক্তিমত্তা বাংলাদেশের সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে যুগ যুগ ধরে তার ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে যাবে।

মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.)এর সাথে যারা নানা বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, যারা লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কর্মপন্থার সাথে একমত ছিলেন না, তাঁরা সবাই যেমন আজ তাকে হারিয়ে খুঁজছেন, তাঁর একান্ত ভক্ত- অনুসারীরাও আজ তাঁদের নেতাকে হারিয়ে শোকাহত। আমার মনে হয় তাঁর পক্ষ ও বিপক্ষের সকলেই একটি বিষয়ে একমত হবেন যে, একটি ব্যক্তি কী পরিমাণ সাহসী, স্পষ্টভাষী ও প্রভাবশালী হলে তসবিহ উঁচিয়ে বলতে পারেন এটাই আমার অস্ত্র। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। মন্ত্রীরা ঐকতানে তার দুর্নাম ছড়ান। বাম নেতারা লাখো মানুষ সাথে নিয়ে তাকে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেন। নির্যাতিত লোকটি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে খতম, দোয়া আর তিলাওয়াত করে বলেন, আমার একটি পুত্র কেন, যদি গোটা পরিবারকেও ধ্বংস

করে দেয়া হয়, তথাপি আমি ইসলামের স্বার্থ ঊর্ধ্বেই তুলে ধরে রাখবো। সব ধরনের বাধা, মামলা, হামলা, ভয়ভীতির ভেতর থেকেও তিনি কাছে পাওয়া লোকজনকে নিজের মিশনের কথা, অস্থিরতার কথা, আবেগ-উৎকণ্ঠার কথা, অনিশেষ সংগ্রাম ও সাধনার কথা বলে গিয়েছেন। বোখারীর সবক দিয়েছেন। নামাযে ইমামতি করেছেন। নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলেছেন। আগামী দিনের করণীয় নির্ধারণ করেছেন। সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন। লাখো মানুষকে নাড়া দিয়ে না ফেরার পথে পা বাড়িয়েছেন। কোটি মানুষের মনে দাগ কেটে গেছেন। বলে গেছেন, যে কোন মূল্যে ইসলামকে ধারণ করে রেখো। দল, মত, জোট, মহাজোট নির্বিশেষে সকল মুসলমান। যুগে যুগে মুফতী আমিনীরা এ বার্তাটিই রেখে যান।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সত্ত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএল-এ পাঠানো হয়।
*	জেলা ভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২০% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যে কোন সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	২০০	৩০০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৭২০	৯০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১০৮০	১২০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১২০০	১৪০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	১৭০০
#	আমেরিকা	১৭০০	২০০০

১বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক একাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী প্রসঙ্গে কিছু কথা

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

আরব বিশ্বে ও বর্তমান দুনিয়ায় কথিত আহলে হাদীস মতবাদ বিস্তারের রূপকার শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী (মৃত ১৯৯৯ ইং)। রাসূল (সা.) এর হাদীসকে বিকৃত করে মুসলমানদেরকে বিভক্ত করার মূল নায়ক তিনি। তিনিই সহীহ হাদীসকে যয়ীফ, আর যয়ীফ হাদীসকে সহীহ বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার মূলমন্ত্র শিখিয়েছেন কথিত আহলে হাদীসদেরকে। চির মীমাংসিত বিষয়ে উস্কানীমূলক বক্তব্যের তিনিই সূচনা করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আকাবিরগণের প্রতি বেআদবীমূলক আচরণ। হানাফী মাযহাবের দলীল হিসেবে কোনো হাদীস পাওয়া মাত্রই মনগড়া যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দুর্বল হাদীসের তালিকায় ফেলে দেয়াই তার প্রধান পেশা। তার জীবনী শীর্ষক কয়েক খ- বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কার নিকট তিনি পড়ালেখা করেছেন এর কোন বিবরণ কোথাও উল্লেখ নেই। মদীনা ইউনিভার্সিটির উস্তাদ ড.আনিস তাহের ইন্দোনেশী আমাদের ক্লাসে আলবানীর জীবনী শীর্ষক দু'সপ্তাহ ব্যাপী আলোচনা পেশ করেছেন, এতেও তিনি শায়খ আলবানীর শিক্ষা ডিগ্রি বিষয়ক কিছুই বলতে পারেন নি। আমরা তার জীবনী গ্রন্থে যা পেয়েছি, তারই লিখিত বই "সিফাতুসসালাত" এবং "সালাতুত তারাবীহ" গ্রন্থ দু'টির অনুবাদক আলবানীর জীবনীতে লিখেন, তিনি তার পিতার পেশা, ঘড়ি মেরামতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।" অতএব কোনো মাদরাসায় ভর্তি হয়ে তার পড়া লেখার সুযোগ কোথায়? কোথায় তার এ সময়? তবে আমাদের উস্তাদ ড.আনিস সাহেব বলেছেন যে, শায়খ আলবানী নিজে নিজে প্রচুর অধ্যয়ন, গবেষণা করতেন। অবশ্য আমরা জানি যারা নিজে নিজে গবেষণায় অবতীর্ণ হয়, তারাই পথভ্রষ্ট হয়, হয় তাদের মাধ্যমে জনগণ বিভ্রান্ত। এধরনের পথভ্রষ্ট বিদ্যানগণের তালিকা এ জগতে বিস্তর লম্বা, কাহিনী তাদের অনেক হৃদয় বিদারক। মনগড়া মতবাদ ছড়িয়ে হঠাৎ আজগবী চমক সৃষ্টি করাই হয় তাদের মূল টার্গেট। তাইতো শায়খ আলবানীর গবেষণায় অজ্ঞতা, বাড়াবাড়ি, দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি, স্ববিরোধিতা ও কল্পনাপ্রসূত মনগড়া মতবাদে ভরপুর। এ সবের বিশাল সূচী আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। আর রচিত হচেছ তার অমার্জিত ভুলত্রুটির দাস্তান শীর্ষক অসংখ্য বই পুস্তক। এ পরিসরে আরব অনারবের অনুস্মরণীয় কয়েক জনের মতামত অতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

আরবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, অসংখ্য গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য গবেষক, আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা তাঁর রচিত "আসারুল হাদীস" নামক কিতাবের ৫১নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

مع أن هذا الرجل ليس له من الشيوخ إلا شيخ واحد من علماء حلب بالإجازة لا بالتلقى والأخذ والمصاحبة والملازمة

এছাড়া এই ব্যক্তির তো কোন শিক্ষক নেই। সিরিয়ার হালবের জনৈক ব্যক্তি তাকে হাদীস চর্চার মাত্র অনুমতি দিয়েছেন। তবে তার কাছেও আলবানী নিয়মিতভাবে পড়া লেখা করেননি।

বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস মাও.হাবীবুর রহমান আ'যমী (রহ.) তাঁর গ্রন্থ الألبانى شذوذه وأخطاؤه(শায়খ আলবানীর ভুলভ্রান্তি ও বিচিত্র মতবাদের দাস্তান) এর ভূমিকায় লিখেন-

والله لا يعرف ما يعرف آحاد الطلبة الذين يشتغلون بدراسة الحديث فى عامة مدارسنا

আল্লাহর কসম! সেই শায়খ আলবানী হাদীস সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞানও রাখেনা, যা আমাদের সাধারণ মাদরাসাগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্ররা জানে।

অতঃপর আ'যমী (রহ.) উক্ত কিতাবে তিন খ- ব্যাপী শায়খ আলবানীর জ্ঞানের পরিধি ও তার ভুলভ্রান্তি এবং বিচিত্র মতবাদের আশ্চর্য চিত্র উদ্ধৃতি সহকারে উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়া শায়খ আলবানীর গবেষণা প্রায়ই বিরোধপূর্ণ ও সংঘর্ষমুখী হওয়ায় আরবের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামগণ তা চিহ্নিত করেছেন। স্বতন্ত্র বই পুস্তক লিখে এসব বিষয়ে মুসলমানদেরকে শায়খ আলবানীর গবেষণামূলক মতামত গ্রহণ করার প্রতি সতর্ক করেছেন। আরবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ হাসান বিন আলী আস সাক্কাফ প্রণীত "তানাকুযাতুল আলবানী" বা আলবানীর গবেষণায় বিরোধপূর্ণ বর্ণনা শীর্ষক দু'খ-ের বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (দারুল ইমাম নববী ওমান থেকে প্রকাশিত।) এতে তিনি শায়খ আলবানীর অসংখ্য হাদীস তুলে ধরেছেন, যেসব হাদীসের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানী তারই রচিত একেক কিতাবে একেক ধরনের মতামত পেশ করেছেন। একই হাদীসকে তিনি কোথাও সহীহ আবার কোথাও দুর্বল এজাতীয় স্ববিরোধী মতামত দেদারসে লিখে গেছেন। শায়খ হাসান তার উল্লেখিত দু'খ- বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

আছে শুধু তার মনগড়া তন্ত্রমন্ত্র আর উলামায়ে কিরামকে আক্রমণের হাতিয়ার। এছাড়া বিরোধিতা ও বাড়াবাড়ির বিদ্যায় তিনি সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত। হাদীস গবেষণার নামে যা করেছেন অধিকাংশই শুভংকরের ফাঁকি, বিচিত্র মতবাদ ছড়ানোর উপকরণ মাত্র। আরবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শায়খ মাহমুদ সাঈদ মামদূহ প্রণীত কিতাব تنبيه المسلم إلى تعدى الألبانى على صحيح مسلم (সতর্ক হে মুসলিম! আলবানীর বাড়াবাড়ির জালে সহীহ মুসলিম) এর ২০৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন-"قد وقفت على اوهام وأخطاء للألبانى - وكفى تعديه على الصحيح" আমি আলবানীর কাল্পনিক কর্মকা- ও ভুলত্রুটির ফিরিস্তি অবগত হয়েছি। বিশেষ করে সহীহ হাদীসের কিতাব প্রসঙ্গে বাড়াবাড়ির বিষয়টি তার কর্মকা-ের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট।

উক্ত বইয়ের ২০৫নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন,

أقول هذا بمناسبة عادة الألبانى مع مخالفيه،فإنه إذا وجد مخالفا له قام وقعد وأرعد وتوعد، وإذا تصفحت كتبه تجد مصداق ذلك، فتراه يقول لأحدهم، 'أشل الله يدك وقطع لسانك'، ويكاد أن يتهم صاحبا له 'بالشرك الأكبر'، وثالثا يتهمه: 'بالكذب'، وأنه :'افاك كذاب'ثم نبزه بلقبه وقد جاء النص بالنهى عنه ورمى كثيرا من علماء المسلمين بالبدعة وما أعظمها من فرية -رغم إقراره أن الامام احمد يقول بقول المرمى بالبدعة!!.ويتهم شهيد عصرنا 'بكفريات'، ويتهم مخالفا له'بمكر،خبث، نفاق، كذب، ضلال....إلخ'والقائمة طويلة والألفاظ كثيرة ولاداعى لإعادتها-

আলবানী তার মতাদর্শের বিপরীত শায়খ আলবানীর স্ববিরোধী মতামত ও ভুলত্রুটির ফিরিস্তি লেখকের নিকট হাজার হাজার জমা রয়েছে, যা পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে আরবের বিজ্ঞ আলেম শায়খ মাহমুদ সাঈদ মামদূহ প্রণীত ৬ ভলিয়মে লিখিত বিশাল কিতাব:

"التعريف باوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف"

(যে সুনান-হাদীসের কিতাব সমূহকে সহীহ ও দুর্বল দু'ভাগ করেছেন তার ভুলভ্রান্তির পরিচয়)

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল গুমারী কর্তৃক প্রণীত–

"القول المقنع فى الردعلى الألبانى المبتدع"

(নতুন মতবাদের প্রবর্তক আলবানীর সন্তুষ্টজনক প্রতিউত্তর)

উস্তাদ বদরুদ্দীন হাসান দিয়াব দামেশকী প্রণীত–

"انوار المصابيح على ظلمات الألبانى فى صلاة التراويح"

(তারাবীর নামায প্রসঙ্গে আলবানীর ভ্রান্তি নির্বাপক আলোক রশ্মি)

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায প্রণীত–

"أين يضع المصلى يده فى الصلاة بعد الرفع من الركوع"

(রুকু থেকে উঠার পর নামাযী আবার কোথায় হাত বাঁধবে?)

শায়খ ইসমাঈল বিন আনসারী প্রণীত–

"تصحيح صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الالبانى فى تضعيفه"

(২০ রাকআত তারাবীর বিশুদ্ধ হাদীসকে আলবানী দুর্বল বলার প্রতি উত্তর)

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) প্রণীত –

"كلمات فى كشف اباطيل وافتراء ات"

(আলবানীর বাতিল মতবাদ ও মিথ্যা অপবাদের উন্মোচনে কিছু কথা)

শায়খ হাসান সাক্কাফ প্রণীত–

"صحيح صفة صلاة النبى ﷺ"

(রাসূল সা. এর বিশুদ্ধ নামায পদ্ধতি)

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আদ দুবাইশ প্রণীত –

"تنبيه القارئ على تقوية ماضعفه الالبانى"

(আলবানী অভিহিত দুর্বল হাদীস শক্তিশালী হিসেবে সতর্ক সংকেত)

শায়খ আবু উমর হাই ইবনে সালেম আল হাই প্রণীত–

"النصيحة فى بيان الاحاديث التى تراجع عنها الالبانى فى الصحيحة"

(যে সব সহীহ হাদীসকে আলবানী দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন সেগুলোতে পুণর্বিবেচনার উপদেশ)

শায়খ ইবনে আব্দুল্লাহ আত তুয়াইজারী প্রণীত–

"التنبيهات على رسالة الالبانى فى الصلاة "

(আলবানীর নামায বিষয়ক কিতাবের প্রতি সতর্কবাণী)

ডক্টর মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আল বুয়াইতী প্রণীত–

"اللامذهبية اخطر بدعة تُهدّد الشريعة الاسلامية"

(লা মাযহাবী মতবাদ মারাত্মক বিপদজনক বিদআতী দল ইসলামী শরীয়তের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি)

এবং শায়খ আতিয়্যা মুহাম্মদ সালিম প্রণীত–

"التراويح اكثر من الف عام"

(এক হাজার বছরে তারাবীর ইতিহাস)

প্রমুখ লেখকগণ তাদের রচনাবলীতে শায়খ আলবানীর ভুলভ্রান্তি ও স্ববিরোধী মতবাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন হাতে কলমে ধরে ধরে, শায়খ আলবানীর বই ও পৃষ্ঠা নাম্বার চিহ্নিত করে। এতে করে পরিস্কারভাবে প্রমাণ হয় যে, হাদীস গবেষণার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর কোনো নিয়মনীতি নেই। নেই এ বিষয়ে তার কোন গতিমতি।

ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন, প্রসঙ্গত উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। আলবানী যখনি কাউকে তার প্রতিপক্ষ বা ভিন্ন মতাদর্শের মনে করেন, তখন দেখতে পাবেন, তিনি বইয়ের পর বই আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তাকে সমালোচনা করে লিখেই যাচ্ছেন। তার আক্রমণের স্বরূপ হিসেবে দেখবেন তিনি প্রথিতযশা বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও মহামনিষীদের ধ্বংস হওয়ার কামনা করেন, তাঁদেরকে মুশরিক, মিথ্যুক, প্রতারক, বিদআতী আখ্যায়িত করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করেন না। যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে আলবানী প্রতিপক্ষ মনে করলে, তাঁদেরকে কাফির, চক্রান্তকারী, দুষ্টু, মুনাফিক, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি অপবাদ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। এতে তার পাষাণ আত্মা তিলমাত্র কাঁপে না। তার ভয়ঙ্কর ন্যক্কারজনক কর্মকা-ের শীর্ষ তালিকায় ইমাম আহমদ (রহ.) কেও বিদআতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এধরনের আচরণ তার দু'একটি ঘটনা নয়; বরং এসব বর্ণনা করে শেষ করার ওপারে।

এই কী একজন আলেমের ভাষা? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাগণের আদর্শ কি মুসলমানদেরকে এমন শিক্ষাই দিয়েছে? একজন নায়েবে নবী, আরো একধাপ এগিয়ে তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষকের দাবিদার-কথিত আহলে হাদীস মতবাদের ইমাম, তার মুখে এ ধরনের অশ্লীল আক্রমনাত্মক আচরণ অবশ্যই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য লজ্জাজনক। যদিও তাদের নিজেদের লজ্জাবোধ হয় না। কারণ তাদের মতে বেআদবী মানেই বীর হওয়ার সমতুল্য।

এভাবে মাসাইলগত বিষয়েও অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মান্যবর উলামায়ে কিরাম এমনকি সৌদী আরবের উলামায়ে কিরামদেরকেও তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন পদে পদে। তাঁদের অবহেলার সুযোগে শায়খ আলবানী মতানৈক্য, বিভ্রান্তি ও উগ্রতার বীজ রোপে দিয়েছেন আরব মরুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাড়ি তার আলবানিয়ায়। পরে সিরিয়ায় হিজরত করেন। তার পিতা নূহ নাজাতী একজন আদর্শ মানব, হানাফী মাযহাবের শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। ছেলের বিতর্কজনিত আচরণে পিতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ত্যাজ্যপুত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তিনি কোনোভাবে নাজাত লাভ করেন। আর জনগণ মুক্তি পায় শায়খ আলবানীকে সিরিয়া থেকে বাহির করে। আর শায়খ আলবানী চেপে বসে সৌদী জনতার ঘাড়ে। রাজতন্ত্রের ভয়ে আতঙ্কিত আলেম সমাজের মাঝে তার নতুন মতবাদ ছড়াতে আরো দারুন সুযোগ এসে যায়। তবে এক পর্যায়ে তাঁদের ঘুম ভাঙ্গে। সবাই সোচ্চার হয় তাঁদের দীর্ঘকালের শায়খ-আলবানীর বিরুদ্ধে। ১৯৯১ খৃস্টাব্দে সরকারী নির্দেশে শায়খ ২৪ঘণ্টার মধ্যে পবিত্র আরবভূমি ছেড়ে জর্ডান যেয়ে আত্মরক্ষা পায়। আমরণ তিনি সেখানেই ছিলেন। আরবের সচেতন উলামায়ে কিরাম কিন্তু এক পর্যায়ে জেগে উঠেছিলেন, হয়েছিলেন প্রতিবাদ মুখর। (আল ইত্তেজাহাতুল হাদীসিয়্যা, শায়খ মাহমূদ সাঈদ মামদূহ)

উদাহরণ স্বরূপ শুধু একটি বিষয় লিখেই এ পরিসরের ইতি টানতে যাচ্ছি। কুরআন হাদীসে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং মুসলিম বিশ্বের চির মীমাংসিত একটি বিষয় হলো, মহিলাদের মুখম-ল ঢেকে রাখা পর্দার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু শায়খ আলবানী শুধু এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বই রচনা করেন। ঘোষণা দেন পর্দা হিসেবে মহিলারা তাদের মুখম-ল ঢাকতে হবে তা কুরআন হাদীসে মোটেও নেই। তবে আরবের উলামাগণ এ বিষয়ে নিরব থাকেন নি। শুধু এরই প্রতি উত্তরে প্রায় দু'ডজন বই লিখেছেন তাঁরা। তন্মধ্যে আরবের স্থায়ী ইফতা বোর্ডের সহসভাপতি শায়খ মুহাম্মদ ছালেহ ইবনে উসাইমীন লিখেছেন, "রিসালাতুল হিজাব" শীর্ষক ছোট একটি বই।(মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ থেকে প্রকাশিত) এতে তিনি আল কুরআনের ১০ টি আয়াত, পবিত্র হাদীস থেকে ১০ টি প্রমাণ এবং ১০ টি ক্বিয়াসের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, মহিলাদের মুখম-ল পর্দা হিসেবে ঢাকা ফরয। আর শায়খ আলবানী তো একটি প্রমাণও খুঁজে পাচ্ছেন না! এর রহস্য কী? কী তার মতলব? কোথায় তার টার্গেট? আশা করি সম্মানিত পাঠকগণই তা বিবেচনা করবেন।

বলাবাহুল্য বর্তমান বাংলাদেশেও কিছু লোক শায়খ আলবানীর জালে শিকার হচেছ। তারা শায়খ আলবানীর বাড়াবাড়ি, অশ্লীলতা, গোঁড়ামী, ভুলত্রুটির দাস্তান, বিচিত্র আদর্শ ও বিভ্রান্তিকর মতবাদকে পুঁজি করে গোটা মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে। অথচ শায়খ আলবানীর এসব বিচিত্র মতবাদের আইওয়াশ ও সিটিস্কেনের লক্ষ্যে শুধু সৌদী আরব থেকেই শতাধিক বই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব ক্ষেত্রে আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা চোখ বন্ধ করে রাখে। আর লুফে নেয় শুধু তার বিচিত্র মতাদর্শ ও শিষ্টাচার বহির্ভূত দিকগুলো। তাইতো শায়খ আলবানীর শিষ্য ও অনুসারীগণ বাড়াবাড়ি ও অশ্লীলতায় আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে।

‘থার্টি ফাস্ট নাইট’ ঈমান ধ্বংসের মহা উৎসব

মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

ভূমিকা :

ইংরেজি সাল গণনার বিষয়টা ইংরেজদের আবিষ্কার নয়। তাই এটি ইংরেজি নববর্ষ নয়। এটি খৃষ্টীয় বা গ্রেগরিয়ান নববর্ষ। ইংরেজরা ১৭৫২ সালে ১ জানুয়ারিকে নববর্ষ হিসাবে গ্রহণ করে। তার ২৩০ বছর আগে অর্থাৎ ১৫২২ সালে ভেনিসে ১ জানুয়ারিকে নববর্ষ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। স্পেন ও পর্তুগাল ইংরেজ তথা বৃটিশদের ১৯৬ বছর আগেই ১ জানুয়ারিকে নববর্ষ হিসেবে গ্রহণ করে। সেই বিবেচনায় কোন মতেই ১ জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষ হতে পারে না। বরং আজকের ১জানুয়ারি খৃস্টানদের গ্রেগরিয়ান নববর্ষ।

খৃষ্টীয় বা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার:

ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী খৃষ্টপূর্ব ৪৬ সালে জুলিয়াস সিজার সর্বপ্রথম ১ জানুয়ারিতে নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করেন। পহেলা জানুয়ারি পাকাপোক্ত ভাবে নববর্ষের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর। খৃস্টানদের ধর্মযাজক পোপ গ্রেগরিয়ানের নামানুসারে যে ক্যালেন্ডারের প্রচলন হয়, ইতিহাসের পালাবদলে আজকে সেই ক্যালেন্ডারকেই ইংরেজি ক্যালেন্ডার বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে ইউরোপসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হচ্ছে।

ইসলামে উৎসবের রূপরেখা :

আমরা অনেকে উপলব্ধি না করলেও, উৎসব সাধারণত একটি জাতির ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। উৎসবের উপলক্ষগুলো খোঁজ করলে পাওয়া যাবে উৎসব পালনকারী জাতির ধমনীতে প্রবাহিত ধর্মীয় অনুভূতি, সংস্কার ও ধ্যান- ধারনার ছোঁয়া। উদাহরণস্বরূপ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন তাদের বিশ্বাস মতে স্রষ্টার পুত্রের জন্মদিন। মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগুলোতে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালিত হত ২৫ মার্চ এবং তা পালনের উপলক্ষ ছিল এই যে, ওই দিন খৃস্টীয় মতবাদ অনুযায়ী মাতা মেরীর নিকট ঐশী বাণী প্রেরিত হয় এই মর্মে যে, মেরী ইশ্বরের পুত্রের জন্ম দিতে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনার পর রোমক ক্যাথলিক দেশগুলো ১ জানুয়ারি নববর্ষ উৎযাপন করা আরম্ভ করে। ঐতিহ্যগত ভাবে এই দিনটি একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই পালিত হত। ইহুদীদের নববর্ষ ‘রোশ হাশানাহ’ ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ইহুদীদের ধর্মীয় পবিত্র দিন ‘সাবাত’ হিসেবে পালিত হয়। এমনিভাবে প্রায় সকল জাতির উৎসব-উপলক্ষের মাঝেই ধর্মীয় চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এজন্যই ইসলামে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে মুসলিমদের উৎসবকে নির্ধারণ করেছেন, ফলে অন্যদের উৎসব মুসলিমদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঈদ (খুশী) রয়েছে, আর এটা (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) আমাদের ঈদ। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম ও অমুসলিমদের উৎসবের পার্থক্য :

ইসলামের এই যে উৎসব, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এগুলো থেকে মুসলিম ও অমুসলিমদের উৎসবের মূলনীতিগত একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য স্পষ্ট হয়। বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করা উচিত। অমুসলিম, কাফির কিংবা মুশরিকদের উৎসবের দিনগুলো হচ্ছে তাদের জন্য উচ্ছৃংখল আচরণের দিন। এদিনে তারা সকল নৈতিকতার সকল বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে অশ্লীল কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, আর এই কর্মকান্ডের অবধারিত রূপ হচ্ছে মদ্যপান ও ব্যভিচার। এমনকি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বহুলোক তাদের পবিত্র বড়দিনেও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে মদ্যপ হয়ে উঠে এবং পশ্চিমা বিশ্বে এই রাত্রিতে বেশ কিছু লোক নিহত হয় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ী চালানোর কারণে। অপরদিকে মুসলিমদের উৎসব হচ্ছে ইবাদতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এই বিষয়টি বুঝতে হলে ইসলামের সার্বিকতাকে বুঝতে হবে। ইসলাম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং তা মানুষের গোটা জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী বিন্যস্ত ও সজ্জিত করতে উদ্যোগী হয়। তাই একজন মুসলিমের জন্য জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইবাদত, যেমনটি কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন– ‘আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন কারনে সৃষ্টি করিনি’। (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত-৫৬) সেজন্য মুসলিম জীবনের আনন্দ-উৎসব আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও অশ্লীলতায় নিহিত নয়,বরং তা নিহিত হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আদেশ পালন করতে পারার মাঝে। কেননা মুসলিমদের ভোগবিলাসের স্থান ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী নয়, বরং চিরস্থায়ী জান্নাত। তাই মুসলিম জীবনের প্রতিটি কাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে থাকবে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাদের ঈমান, আখিরাতের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা।

থার্টি ফাস্ট নাইট পালন করা :

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে 'থার্টি ফাস্ট নাইট' পালন করা নিঃসন্দেহে হারাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে। (সুনানে আবু দাউদ) মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি একটি নির্দিষ্ট বিধান এবং সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি'। (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত- ৪৮) খৃস্টান পাদ্রী পোপ গ্রেগরিয়ান- এর নামানুসারে যে ক্যালেন্ডার, সেই ক্যালেন্ডারের পরবর্তী চলন ইংরেজি ১ জানুয়ারিকে নববর্ষ হিসেবে পালন করা কোনো মুসলমানের আদর্শ হতে পারে না।

আমাদের করণীয় :

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংরেজি নববর্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ এতে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ইসলাম বিরোধী বিষয় রয়েছে। (এক) শিরকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি, চিন্তাধারা ও সংগীত। (দুই) নগ্নতা, অশ্লীলতা, ব্যভিচারপূর্ণ অনুষ্ঠান। (তিন) গান ও বাদ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। (চার) সময় ও অর্থ অপচয়কারী অনর্থক বাজে কথা ও কাজ। এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে নিজে এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা এবং বাঙালি মুসলিম সমাজ থেকে এই প্রথা উচ্ছেদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো নিজ নিজ সাধ্য ও অবস্থান অনুযায়ী। এ প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

(এক) এ বিষয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্ব হবে আইন প্রয়োগের দ্বারা নববর্ষের যাবতীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

(দুই) যেসব ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী, তাদের কর্তব্য হবে অধীনস্থদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা।

(তিন) মসজিদের ইমামগণ এ বিষয়ে মুসল্লীদেরকে সচেতন করবেন ও বিরত থাকার উপদেশ দেবেন।

(চার) পরিবারের প্রধান এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন যে, তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কিংবা অধীনস্থ অন্য কেউ যেন নববর্ষের কোন অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়।

(পাঁচ) এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, সহকর্মী ও পরিবারের মানুষকে উপদেশ দেবেন এবং নববর্ষ পালনের সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করুন এবং কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

"আর তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার পরিধি আসমান ও যমীনব্যাপী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১৩৩)

e-mail: f.karim@yahoo.com

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকার

কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে

বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা

১,২,৩ রবিউল আওয়াল ১৪৩৪হিজরী

১৪,১৫,১৬ জানুয়ারী ২০১৩ঈসায়ী

রোজ : সোম, মঙ্গল ও বুধবার

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা ।

প্রসঙ্গঃ জুমু'আর নামায

মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী ৩১২
ঢাকা।

জিজ্ঞাসাঃ

মুসল্লী ও মসজিদ থেকে ২০/২৫ হাত দূর যেখান থেকে জুমু'আর নামাযের ইমাম সাহেবের আওয়াজ মাইকের মাধ্যমে শোনা যায় এমন স্থান থেকে ইক্তিদা সহীহ হবে কি না? উল্লেখ্য যে, ওই ২০/২৫ হাত জায়গার মধ্যে মসজিদের সাথে কোন সংযোগ নেই। বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধানঃ

ইমাম ও মুক্তাদিদের মাঝে দুই কাতার পরিমাণ বা তার বেশি জায়গা খালি থাকলে ইক্তিদা সহীহ হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইক্তিদা সহীহ হবে না।(আদদুররুল মুখতার ১/৫৮৬, মাসায়েলে নামাযে জুমু'আ পৃ:২৫২)

প্রসঙ্গঃ ঈদের নামায

মুহাম্মদ আখতার হুসাইন
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসাঃ

নামাযের মধ্যে ইমাম মুক্তাদীগণ থেকে কতটুকু উপরে দাঁড়াতে পারবে। এবং ঈদের নামাজের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ছাড় আছে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধানঃ

সকল নামাযের ক্ষেত্রে ইমাম মুক্তাদী থেকে এক হাতের কম উঁচুতে দাঁড়ানোর অবকাশ রয়েছে। ঈদের নামযের ক্ষেত্রেও হুকুম এক ও অভিন্ন। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১২০, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ৩/৩৪৩, আদদুররুল মুখতার ১/৬৪৬)

প্রসঙ্গঃ দরূদ শরীফ

মুহাম্মদ ইবরাহীম
চান্দনা, চৌরাস্তা
গাজীপুর।

জিজ্ঞাসাঃ

নামাজের বাহিরে যে স্থানসমূহে আমরা দরুদ পড়ে থাকি সেখানে "صلوة " এই মাদ্দার দ্বারাই দরুদ পড়তে হবে। না অন্য শব্দ দিয়েও দরুদ আদায় হবে। যেমন جزى الله عنا محمدا ما هو اهله এই বিষয়ে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করে আমাকে কৃতজ্ঞ করবেন।

সমাধানঃ

কুরআন হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের ভাষ্য মতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, صلوة মাদ্দাহ ছাড়া অন্য শব্দ দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য দু'আ করা জায়েয হলেও তা দরুদ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং দরুদ হওয়ার জন্য صلوة মাদ্দাহ দ্বারা দু'আ করা আবশ্যক। (রুহুল মা'আনী ২২/৩৪২, আহকামুল কুরআন ৩/৫০০-৫০২)

প্রসঙ্গঃ দাফন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান
নেত্রকোনা,দর্গাপুর।

জিজ্ঞাসাঃ

আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই প্রথা আছে যে, যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় তারপর তার কবরের মধ্যে চার পাঁচ হাত লম্বা মাঝারি ধরণের একটা বাঁশকে উপরের মাথা ঠিক রেখে তার নিচের মাথা থেকে বাঁশটাকে চিরে তার উপরের মাথা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় অনুরূপ চারটা চির করা হয়। তারপর এই মাথাকে কবরের চার কোণে গেড়ে দেওয়া হয় এবং উপরের মাথাটা ঠিক কবরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে থাকে, যার আকৃতি হয় গুম্বুজের ন্যায়। উল্লেখিত প্রথার হাক্বিকত কী? এবং সমাধান কি? জানিয়ে উপকৃত করবেন।

সমাধানঃ

প্রশ্নে বর্ণিত কাজটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামও সালফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত নয় বিধায় তা পরিহারযোগ্য। (বুখারী১/৩৭১,আবু দাউদ ২/৬৩৫,তিরমিযী ২/৯৬,রদ্দুল মুহতার ১/৫৬০)

প্রসঙ্গঃ মীলাদ

মুহা: ফখরুল ইসলাম
সূর্যমুখী, হাতিয়া
নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় একজন হাফেজ সাহেব আছে। সে চট্টগ্রাম সরকারী মাদরাসায় লেখাপড়া করে। বাড়িতে এসে মীলাদ কিয়াম করে এবং অন্যকেও করার জন্য বলে। আর যারা মিলাদ কিয়াম করে না তাদেরকে কাফের বলে। যেমন, আশরাফ আলী থানবী, হুসাইন আহমদ মাদানী, আহমদ শফী প্রমুখ। এখন আমার জানার বিষয় হলো, মীলাদ কিয়াম সম্পর্কে শরীয়তের কোনো নির্দেশনা আছে কি না? এবং যারা এ সকল বুযুর্গদেরকে কাফের বলে শরীয়তে তাদের হুকুম কি? উক্ত ব্যক্তি নিজেকে সুন্নী বলেও দাবী করে। কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

সমাধানঃ

(ক) মূলত মিলাদ বলতে হুজুর

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবন বৃত্তান্তের আলোচনাকে বুঝায় যা অত্যন্ত পূণ্যময় ও সাওয়াবের কাজ। আর বর্তমানে সমাজে প্রচলিত মিলাদ যেখানে মনগড়া পদ্ধতিতে তালে তাল মিলিয়ে কিছু দরুদ পাঠ করা হয়। ইসলামী ইতিহাসের প্রথম ছয় শতাব্দী পর্যন্ত এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৬০৪ হিজরী সনে সর্বপ্রথম বাদশা মুযাফফরুদ্দীন কৌকুরী এর প্রচলন ঘটান। ইসলামী শরীয়তে এমন নব উদ্ভাবিত কাজ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হাজির নাযির মনে করে কিয়াম করা আরো জঘন্যতম কাজ। বিধায় এমন মনগড়া দরুদ পাঠের পদ্ধতি পরিহারযোগ্য। (মুসলিম ২/৮০১, ইবনে মাজাহ৪/২৬৬, মা'আরিফুল কুরআন সুরা নিসা ১১৫)

(খ) প্রশ্নে উল্লেখিত বুযুর্গদেরকে কাফের বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। যারা তাদেরকে কাফের বলে তারা চরমপর্যায়ের ফাসেক ও পথভ্রষ্ট। তাওবা ছাড়া তাদের সংশোধনের কোন বিকল্প পথ নেই। (বুখারী ৭/১১০,ফাতাওয়ায়ে ওসমানী ১/৭৮)

প্রসঙ্গঃ মসজিদ ফান্ড

মুহাম্মদ রিজওয়ানুল করীম
মনিরামপুর
যশোর।

জিজ্ঞাসাঃ

এক মসজিদের টাকা অন্য মসজিদে খরচ করা বৈধ হবে কি না? এমন করে ফেললে গোনাহগার হবে কি না? জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

সমাধানঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি কোনো মসজিদের ফান্ডে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা জমা থাকে, আর তা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে এ মসজিদের প্রয়োজন না হওয়ার প্রবল ধারণা হয়, তাহলে ওই মসজিদের অতিরিক্ত টাকা পার্শ্ববর্তী মসজিদের প্রয়োজনে খরচ করার অবকাশ আছে। এতে তারা গোনাহগার হবে না। আর বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় যারা এভাবে অন্য মসজিদে টাকা দিবে তারা নিজেদের তরফ হতে ওই পরিমাণ টাকা মসজিদ ফাে-ফিরিয়ে দিবে। (আদদুররুল মুখতার ৪/৩৫৯, ফাতহুল ক্বাদীর ৫/৪৪৬)

প্রসঙ্গঃ নামাযের দ্বিতীয় জামা'আত

মুহাম্মদ মিরাজুদ্দীন
আব্দুল্লাহপুর, সদর
যশোর।

জিজ্ঞাসাঃ

মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করার হুকুম কি? ইমাম মুয়াজ্জিন নির্ধারিত থাকা না থাকার ক্ষেত্রে মাসআলা বা হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান:

ইমাম মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট আছে এমন মসজিদে নির্দিষ্ট সময়ে জামাত আদায় হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বার জামা'আত করা মাকরুহ। নির্দিষ্ট ইমাম মুয়াজ্জিন না থাকলে মাকরুহ হবে না।(ফাতাওয়ায়ে শামী১/৫৫৩,ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৭/১১৯,এমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩৬৯,কিফায়াতুল মুফতী ৩/১৪৪)

প্রসঙ্গঃ কুরবানীর মান্নত

মুহাঃ সলিমুল্লাহ
বি-বাড়িয়া।

জিজ্ঞাসাঃ

আমাদের এলাকায় একজন গরিব মহিলার একটি বকরি অসুস্থ হলে সে বলল, বকরিটা সুস্থ হলে আগামী কুরবানীর ঈদে কুরবানী করে আমি নিজে খাবো আর গরীব মিসকীনকেও দান করব। কিন্তু ঈদ আসার আগে উক্ত বকরিটি গাভীন হয়ে যায়। বাচ্চাও পেটে বড় হয়। অতঃপর ايام اضحيه অর্থাৎ কুরবানীর দিনগুলো শেষ হয়ে গেল। বাচ্চাও জন্মাল। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত মহিলার জন্য করণীয় কি?

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলার উপর মান্নতকৃত বকরী তার বাচচাসহ গরীব মিসকীনদেরকে জীবিত সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব।(আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০,রদ্দুল মুহতার ২/৩২১,ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫৫৮)

প্রসঙ্গঃ আযান

হা: মাও: শাহ আলম
দোগাছিয়া, চুড়ামনকাটি
সদর, যশোর।

জিজ্ঞাসাঃ

(১) আযানের উত্তরের মাঝে اشهد ان محمد ارسول الله বলার পরে صلى الله عليه وسلم বলা যাবে কি না? যদি বলা যায় কোন দলীলের ভিত্তিতে বলা যাবে। যদি কেউ বলে তাহলে সে একটি বিদ'আত কাজ করেছে এমন বলা যাবে কি না?।

(২) ক. খুতবার মাঝে হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের নাম আসলে رضى الله تعالى عنه বলার বিধান কি? খ. رضى الله تعالى عنه যদি হাদীসের অংশ হিসেবে বলা না হয় তাহলে তা বিদ'আত হবে কিনা? উদাহরণ স্বরুপ اللهم اغفر للعباس رضى الله تعالى عنه বলার পরে الخ বলা যাবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধানঃ

(১)"اشهد ان محمدا رسول الله"এর উত্তরে ওই বাক্যটি বলাই হাদীসের শিক্ষা। এর চেয়ে বেশি কিছু যোগ করার কোন ভিত্তি নেই। ভিত্তিহীন অতিরিক্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকাই নিরাপদ।

(২) সাহাবায়ে কেরামের নাম আসলে

رضى الله عنه বলা মুস্তাহাব। চাই খুতবার সময় হোক বা অন্য কোন সময় এবং তা হাদীসের অংশ না হলেও বিদ'আত হবে না। (রদ্দুল মুহতার ১/৩৯৮, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ২/১২১, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ৯/১০০, আল-বাহরুর রায়িক্ব ৮/৪৮৭)

প্রসঙ্গঃ মান্নত

মুহা: হিযবুল্লাহ
বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসাঃ

(ক) এক ব্যক্তি বলেছেন, যদি আমার সন্তান সুস্থ হয় তাহলে গরু কেটে খাওয়াবো। আল্লাহর রহমতে সন্তান সুস্থ হয়েছে। শরীয়ত অনুযায়ী এটা মান্নত হবে কিনা?

(খ) উক্ত গরুর গোশত ধনী ব্যক্তি ও মান্নতকারীর পরিবার-পরিজন খেতে পারবে কিনা?

সমাধান :

(ক) প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তির উক্তি "যদি আমার সন্তান সুস্থ হয় তাহলে গরু কেটে খাওয়াবো" দ্বারা মান্নত হয়েছে এবং তার জন্য এ মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৭২,বেহেশতী জেওর৩/৪৯)

(খ) মান্নত করার সময় ধনীদের কথা উল্লেখ করা না হলে মান্নতের গোশত ধনী ব্যক্তি ও মান্নতকারীর পরিবার-পরিজন খেতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া ৫৪৮,আদ্দুররুল মুখতার মা'আ রাদ্দিল মুহতার ৬/৩২১)

প্রসঙ্গঃ পর্দা

মুহা: উসমান
ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসাঃ

আমরা ওয়াজ নসীহতে শুনি ওই মহিলা থেকে মহিলাদের পর্দা করা জরুরী যে পর্দাহীনভাবে পুরুষের মত চলাফেরা করে। এখন আমার জানার বিষয় হল; আমাদের দেশে যে সমস্ত স্কুল-কলেজে পুরুষ মহিলা একসাথে বেপর্দাভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। এবং পুরুষের সাথে এদিক সেদিক চলা ফেরা করে, ওই মহিলাদের থেকে পর্দাওয়ালা মহিলারা পর্দা করার শরীয়তের বিধান কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

সমাধানঃ

পর্দানশীন চরিত্রবান মহিলাদের জন্য নিজের ইজ্জত ও সতিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে চরিত্রহীন ও বেপর্দা চলাচলকারী মহিলাদের থেকে পর্দা করার কথা ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন। সে হিসেবে প্রশ্নে বর্ণিত বেপর্দা মহিলাদের থেকে পর্দা করা উচিত। (রদ্দুল মুহতার ৯/৫৩৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া৪/১৯৬)

প্রসঙ্গঃ রিংটোন

মুহা: জুনায়েদ তাহের
চিকনছড়া, ভূজপুর, ফটিকছড়ি
চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসাঃ (১)

ঘড়ির এলার্ম টোন, কলিংবেল মোবাইলের রিংটোন ইত্যাদিতে আজান ও কুরআন তেলাওয়াতের সুর ব্যবহার করা যাবে কি না?

সমাধানঃ (১)

ঘড়ির এলার্ম টোন, কলিংবেল মোবাইলের রিংটোন ইত্যাদিতে আজান ও কুরআন তেলাওয়াতের সুর ব্যবহার করা এক প্রকারের আজান ও কুরআন অবমাননার শামিল বিধায় তা বৈধ নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৭৯, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩১৬,)

প্রসঙ্গ : ঈদের ইমামত

জিজ্ঞাসাঃ (২)

বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক জায়গায় ঈদের নামায পড়ানোর জন্য মুসল্লিদের থেকে কালেকশন করে ইমাম সাহেবকে টাকা দেওয়া হয়। জানার বিষয় হল; ঈদের নামায বাবদ ইমাম সাহেবকে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা দেওয়া এবং ইমাম সাহেবের জন্য তা নেওয়া জায়েয হবে কিনা? জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান : (২)

বিভিন্ন কারণে ফেক্বাহবিদগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুম'আ এবং ঈদের নামায পড়িয়ে বিনিময় নেওয়াকে বৈধ বলেছেন।(আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৮,ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ১০/৩৩৫)

প্রসঙ্গঃ জানাযা

মুহা: আব্দুল্লাহ আল মামুন
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসাঃ

আমরা অনেক সময় একই মৃত ব্যক্তির একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার সম্মুখীন হই। অনেক ইমাম সাহেব নির্দ্বিধায় দ্বিতীয়, তৃতীয় জানাযা নামায পড়িয়ে দেন। আবার অনেক ইমাম সাহেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় জানাযা নামায পড়তে রাজি হননা। এতে আমরা এলাকার মানুষ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছি। কোন ইমাম সাহেবের মত সহীহ আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, কারণ দুই ইমাম সাহেবই আলেম। তাই আমাদের জানার বিষয় হলো, মৃত ব্যক্তির জানাযা একাধিকবার করা যাবে কিনা? যে সকল ইমাম সাহেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার জানাযা পড়িয়ে থাকেন তাদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি জানতে চাই।

সমাধানঃ

মৃত ব্যক্তির ওলি নিজে জানাযা পড়ালে বা তার সম্মতিতে পড়ানো হলে দ্বিতীয় বার জানাযার নামাজ পড়া বা পড়ানোর শরীয়তে অনুমতি নেই। যারা জেনে বুঝে এরূপ জানাযার নামায পড়াবে তাদের কাজ শরীয়ত পরিপন্থী বলে গণ্য হবে।(আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২২৪,আল-বাহরুর রায়িক্ব ১/৩১৮, রদ্দুল মুহতার ৩/১৩৯)

প্রসঙ্গঃ দাফন

মাওঃ মুজ্জাম্মেল হক
রুপনাই, গোপালপুর,
সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসাঃ

মায়্যিতকে কবরে শোয়ানোর সুন্নাত তরিকা কি? জানতে চাই ।

সমাধানঃ

মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান কাতে চেহারাসহ পুরা শরীর কেবলামুখি করে শোয়ানো সুন্নাত ।(ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭১২, আল বাহরু
র রায়িক্ব ২/৩৩৯)

প্রসঙ্গঃ ক্রয়-বিক্রয়

আলহাজ্ব মাষ্টার হেকিম
বুনিয়াদপুর, ইশ্বরগঞ্জ
মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসাঃ

ছয়জন ব্যক্তি মিলে কুরবানীর জন্য একটি গরুর দাম নির্ধারণ করে। উল্লেখ্য যে, উক্ত গরুর মালিক ও ওই ছয় জনের একজন। অতঃপর গরুর মালিক তার শরিকদের কাছে বায়না দাবি করে, কিন্তু তার শরিকরা মালিককে বায়না হস্তান্তর করেনি। তারপর মালিক তার শরিকদেরকে বলল, আমি শুধু গরুকে আজকের খাবার দিব। তারপর খাবার দেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের। এমতাবস্থায় উক্ত গরুটি মালিকের বাড়িতেই ছিল। ঘটনাক্রমে গরুটি মালিকের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়। অতএব, আমার প্রশ্ন হচেছ যে, ওই ক্রেতা শরিকদের বিক্রেতাকে টাকা পরিশোধ করতে হবে কি না?

সমাধানঃ

তার ওই প্রস্তাব মেনে খাবারের দায়িত্ব সকলে গ্রহণ করার পর যথাযথ হেফাযত সত্বেও যদি গরু চুরি হয়ে থাকে তবে তার মূল্য সে প্রাপ্য হবে। অপর শরিকগণ নিজ অংশ পরিমাণ আদায় করতে বাধ্য থাকবে। আর যদি গাফলতির দরুন চুরি হয় তবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৩/১৮, রদ্দুল মুহতার ৪/৫১১)

প্রসঙ্গঃ ক্রয়-বিক্রয়

মুহাম্মদ মুখলেছ মাষ্টার
তেরা বাজার, নেত্রকোনা সদর।

জিজ্ঞাসাঃ

বর্তমান বাজারে অনেক পণ্য সামগ্রী গ্যারান্টি সহকারে বিক্রি করা হয়। এবং বলা হয় এত সময়ের ভিতরে নষ্ট হলে ফেরৎ নেওয়া হবে। প্রশ্নহলো ১.এভাবে গ্যারান্টি দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ কিনা? ২.গ্যারান্টির সময়ের পূর্বেই যদি ওই পণ্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতাকে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করতে পারবে কিনা? দয়া করে শরয়ী সমাধান জানাবেন।

সমাধানঃ

গ্যারান্টি দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে। এবং সময়ের পূর্বে পণ্য নষ্ট হলে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে পণ্যটি পরিবর্তন করার অবকাশ রয়েছে। তবে ক্রেতা-বিক্রেতাকে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করতে পারবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৭/১৭,)

প্রসঙ্গঃ মওদূদীর তাফসীর

হাফেজ মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন
বায়তুল ইসলাম জামে মসজিদ
নদ্দা পাড়া, উত্তরা
ঢাকা-১২৩০

জিজ্ঞাসাঃ

একদিন জনৈক পুলিশ আমাকে বলে, আপনাদের মসজিদে যদি জামা'তে ইসলামীর কোন বই থাকে তাহলে সরিয়ে ফেলবেন। একথা শুনে আমি ভীত হই এবং আমাদের মসজিদে রাখা মওদুদী রচিত তাফহীমুল কুরআন সরিয়ে ফেলার চিন্তা করি। যেহেতু তাফসীরটিতে ভুল ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই অন্য কাউকে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আবার তাতে কুরআনের আয়াত রয়েছে এর যাতে অসম্মানী না হয় এ কথা ভেবে কবরস্থানের এক কোনে পবিত্রস্থানে গর্ত খনন করে সেখানে রেখে মাটি দিয়ে ঢেকে দেই। এখন এলাকায় ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে যে, এলাকার কতক লোক বলছে, এই তাফসীরুল কুরআন মাটিতে পুতে ফেলায় ইমাম ও মুয়াজ্জিন ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। এখন জানার বিষয় হল; আমার এ কাজটি কি করা ঠিক হয়েছিল? আর এতে কি ইমাম, মুয়াজ্জিন আসলেই ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে? উল্লেখ্য যে, বর্তমানে কিতাবগুলো মাটি হতে তুলে ফেলেছি। এখন এগুলোকে আমি কি করতে পারি। জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধানঃ

মওদুদী সাহেব রচিত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন ভুল এবং ভ্রান্ত তাফসীর। যা সাধারণ মুসলমানদের পড়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এধরনের তাফসীর গ্রন্থ নদীতে ফেলে দেয়া বা মাটিতে পুতে রাখাই হচ্ছে কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যথাযথ ব্যবস্থা। তাই আপনার এ কাজটি সঠিক ছিল। এর দরুন ইমাম, মুয়াজ্জিন সাহেব কে ধর্মত্যাগী আখ্যা দেয়া মুর্খতার পরিচায়ক। মুসল্লিদের ঈমান, আমল রক্ষার্থে উক্ত ভ্রান্ত তাফসীর গ্রন্থের মাঝে বিদ্যমান কুরআনের প্রতি লক্ষ্য করে পরিস্কার কাপড়ে জড়িয়ে নিরাপদ স্থানে দাফন করে দেয়া বাঞ্ছনিয়।(ফয়জুল বারী ৪/২৬৪,ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১/১৮)

প্রসঙ্গঃ অগ্রিম পারিশ্রমিক প্রদান

মুহাঃ লাইসুর রহমান
ইছাইল, কাহারোল
দিনাজপুর।

জিজ্ঞাসাঃ

আমাদের এলাকায় একটা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, গরীব কৃষকরা যে মৌসুমে তাদের অভাব থাকে তারা ধনী চাষীদের থেকে অগ্রীম টাকা এই শর্তে নেয় যে, আগামী ধান কাটার মৌসুমে তার ধান বিঘা প্রতি ৩০০ টাকা করে কেটে দিবে। যে সময় প্রতি বিঘা ধান কাটার পারিশ্রমিক থাকে ৫০০ টাকা। এ পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত কিনা? জানালে উপকৃত হব।

সমাধানঃ

প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে পারিশ্রমিক অগ্রিম প্রদান করতে শরীয়তে কোন আপত্তি নেই।(ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া ১১৩,রদ্দুল মুহতার ২/১০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৩৮৪)

প্রসঙ্গঃ ওয়াকফ

ছিদ্দিক আহমদ

বুরহানুদ্দীন মিয়াজী পাড়া।

জিজ্ঞাসাঃ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার অন্তর্গত মল্লিক সুবহান মৌজার ১২৭ নং খতিয়ানের ২১৮৭ নং দাগ (যার পরিমাণ ২১ শতক) R.S. জরিপে মসজিদের নামে রেকর্ড হয়। ওই দাগের একাংশে ১ শতক জায়গায় পূর্ব থেকে মসজিদ অবস্থিত ছিল, কিন্তু পরবর্তিতে মসজিদ সরিয়ে ওই খতিয়ানের ২১৭৫ নং দাগে স্থাপন করা হয় এবং পূর্বের মসজিদ ঘরের জায়গাসহ পুরা দাগের জায়গা ২১ শতক অবহেলিত রয়ে যায়। মসজিদ স্থানান্তরের কাজটি, আনুমানিক ৭৫ বৎসর পূর্বে হয়। তখন থেকে রীতিমত নতুন মসজিদে জুম'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায হতে থাকে, আর পূর্বের মসজিদ ও তার নামে রেকর্ডকৃত জায়গা পতিত অবস্থায় থাকে। B.S. জরিপে ওই পুরা দাগটি কবরস্থান বলে রেকর্ড হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে যেখানে মসজিদ অবস্থিত তা মূল মালিকের ওয়ারিশদের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। এ জরিপ মতে মসজিদের নাম নিশান কোন দাগে রাখা হয়নি, অথচ বর্তমান মসজিদটি B.S. জরিপের প্রায় ৪০ বৎসর আগে থেকে ওই জায়গার মূল মালিকের জীবদ্দশায় স্থাপিত হয়ে চলে আসছে। এখন জানার বিষয় হলঃ

১। ২১৮৭ নং দাগের যে পরিমাণ জায়গায় মসজিদ অবস্থিত ছিল, তার সংরক্ষন করা জরুরী হবে কিনা? ওই স্থানে দাফন বা অন্য কোন কাজ করা যাবে কিনা?

২। ওই দাগের ২১ শতক জায়গা যা মসজিদের নামে R.S. জরিপে রেকর্ড হয়েছে, তা কবরস্থানে রুপান্তরিত করা সহীহ হবে কিনা উল্লেখ্য যে, ওই দাগটি সরকারী খাস জমি ছিলনা তা ফরহাত আলী গং এর খরিদা সম্পত্তি এবং তারা মসজিদের নামে রেকর্ড করে গেছেন।

৩। ওই জায়গা মসজিদ খাতে ব্যবহার করা জরুরী হলে তার আয় বর্তমান পার্শ্ববর্তী মসজিদে ব্যয় করা সহীহ হবে কিনা? ৪। না জানা বশত ওই জায়গায় মৃত দাফন করা হলে তা ওইভাবে রাখা যাবে কিনা?

৫। বর্তমান মসজিদ যা মূল মালিকদের সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা শরয়ী মসজিদ হিসাবে বিবেচিত হবে কিনা? স্মর্তব্য যে বর্তমানে, ওই জায়গা যাদের নামে রেকর্ড হয়েছে মসজিদেও এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সম্মতি রয়েছে।

সমাধানঃ

১। যে স্থানে মালিকের সম্মতিতে মসজিদ নির্মিত হয়ে নামায চালু হয় তা শরয়ী মসজিদ হিসাবে পরিগণিত হয়ে যায়। কিয়ামত পর্যন্ত তা মসজিদ রূপে বহাল রাখা মুসলমানদের বিশেষত এলাকার লোকদের জন্য জরুরী হয়ে যায়। তার পরিবর্তন ও স্থানান্তর কোন অবস্থায় জায়িয হয় না। এতদসত্ত্বেও অপ্রয়োজনে যারা পরিবর্তন ও স্থানান্তর করে তারা বড় গোনাহগার হয়। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত ২১৮৭ দাগের যে অংশে মসজিদ অবস্থিত ছিল, তাকে মসজিদ হিসাবে সংরক্ষন করা বর্তমান এলাকাবাসীর জন্য অতীব জরুরী-ওয়াজিব। তা না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ওই স্থানে দাফন বা অন্য কোন কাজ করা যাবে না। সম্পূর্ণ মসজিদের মতই আচরণ করতে হবে।

২-৩। ঐ দাগের বাকি জায়গা যা মসজিদের নামে B.S রেকর্ড হয়েছে, তাও মসজিদের সম্পদ হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। R.S জরিপের বিপরীতে B.S. জরিপে কবরস্থানের নাম বসানো হলেও শরীয়ত অনুসারে R.S বলবৎ থাকবে এবং ওই জায়গা মসজিদ খাতে ব্যবহার করা জরুরী। কবরস্থান মাদরাসা বা অন্য কোন ভাল কাজেও এর ব্যবহার করা সঠিক হবে না। অবশ্য ওই দাগের আয় ওই মসজিদের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন না হলে পার্শ্বে অবস্থিত মসজিদে তার আয় উৎপাদন ব্যবহার করা যাবে।

৪। ওই দাগের (২১৮৭) কোন অংশে দাফন করা সহীহ হবেনা। না জানা বশত যে সব দাফন হয়েছে তা লাশ সম্পূর্ণ মাটিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৫। বর্তমান মসজিদ যা ২১৭৫ দাগে অবস্থিত তা ও শরয়ী মসজিদ হিসাবে স্বীকৃত হবে। কিয়ামত পর্যন্ত তা আবাদ রাখতে হবে। যেহেতু এ মসজিদ মালিকদের সম্মতিতে নির্মিত হয়েছে তাই সরকারী রেকর্ড না হলেও কোন অসুবিধা হবেনা। এ মসজিদে কোন সময় মালিকানা দাবী সম্পূর্ণ অবৈধ ও অগ্রাহ্য হবে। (আহসানুল ফাতোয়া ৬/৪৫১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৬/১৭২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৬/১৯১,ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৬/১৭৫)

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৩

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

ফরজ নামাযের রাক'আত সংখ্যা :

ফজর	২ রাক'আত
জুহর	৪ রাক'আত
আসর	৪ রাক'আত
মাগরিব	৩ রাক'আত
ইশা	৪ রাক'আত

উল্লেখিত ফরজ নামাযের রাক'আত সংখ্যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জামানা থেকে আজপর্যন্ত ধারাবাহিক আমল বা তাওয়াতুরে আমলীর মাধ্যমে সাব্যস্ত। এছাড়াও অসংখ্য হাদীস শরীফে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

جاء جبريل الى النبى ﷺ فقال قم فصل وذلك دلوك الشمس حين مالت فقام رسول الله ﷺ فصلى الظهر اربعا ثم اتاه حين كان ظله مثله فقال مثله فقال قم فصل فقام فصلى العصر اربعا ثم اتاه حين غربت الشمس فقال له قم فصل فقام فصلى المغرب ثلاثا ثم اتاه حين غاب الشفق فقال له قم فصل فقام فصلى العشاء الاٰخرة اربعا ثم اتاه حين برق الفجر فقال له قم فصل فقام فصلى الصبح ركعتين۔

"হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, আপনি নামায আদায় করুন। আর তা ছিল সূর্য ঢলে পড়ার সময় যখন সূর্য ঝুঁকে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়ালেন এবং জুহরের চার রাক'আত নামায আদায় করলেন। অতঃপর আবার হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আগমন করলেন। যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ ছিল, এবং আগের মতই বললেন, আপনি দাঁড়ান, নামায পড়ুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসরের চার রাক'আত নামায আদায় করলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তখন তাশরীফ আনেন যখন সূর্যাস্ত হয়ে যায় এবং বললেন, আপনি দাঁড়ান, নামায আদায় করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের তিন রাক'আত নামায আদায় করলেন। আবার হযরত জিবরাঈল (আ.) শফক (অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশের দিগন্ত জুড়ে বিদ্যমান লালিমা) আড়াল হয়ে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আগমন করেন এবং নামায পড়তে বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইশার চার রাক'আত নামায আদায় করলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.), ফজর উদয় হওয়ার পর এসে বললেন, আপনি নামায আদায় করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন। (মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, নাসবুর রায়া ১/২২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্তাবারানী ৭/১২৯, ১৩০, আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১/৩৬১)

সুন্নাত নামাযের রাক'আত সংখ্যা :

সুন্নাতে মুআক্কাদা মোট ১২ রাক'আত–

ফজরের পূর্বে ২ রাক'আত

জুহরের পূর্বে ৪ রাক'আত

জুহরের পরে ২ রাক'আত

মাগরিবের পরে ২ রাক'আত

এবং ইশার পরে ২ রাক'আত

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال رسول الله ﷺ من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক'আত নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে। ৪ রাক'আত জুহরের পূর্বে, ২ রাক'আত জুহরের পরে, ২ রাক'আত মাগরিবের পর, ২ রাক'আত ইশার পর এবং ২ রাক'আত ফজরের পূর্বে। (জামেয়ে তিরমিযী ১/৯৪, সহীহে মুসলিমে ও এই হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে

বর্ণনা করা হয়েছে ১/২৫১)

ফজরের সুন্নাত :

ফরজের পূর্বে ২ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা।

১. হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لم يكن النبى ﷺ على شىء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر۔

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের দু'রাক'আত ফরজের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাতকে যেরূপ গুরুত্ব দিতেন আর কোনো নফল নামাযে এত গুরুত্ব দিতেন না। (সহীহে বুখারী ১/১৫৬, সহীহে মুসলিম ১/২৫১)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قال رسول الله ﷺ لا تدعوهما وان طردتكم الخيل۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাকে যদি ঘোড়া পদদলিতও করে তারপরও তুমি ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়বে না। (সুনানে আবী দাউদ ১/১৮৬, তাহাবী ১/২০৯)

জুহরের সুন্নাত :

ফরজের পূর্বে ৪ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং পরে ২ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা ও ২ রাক'আত নফল।

১. হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان النبى ﷺ كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত কখনো ছাড়তেনা না। (সহীহে বুখারী ১/১৫৭)

উক্ত হাদীস দ্বারা ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের গুরুত্বও প্রমাণিত হয়ে যায়।

২. হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال رسول الله ﷺ من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا حرمه الله تعالى على النار۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং জুহরের পরে চার রাক'আত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দিবেন। (জামেয়ে তিরমিযী ১/৯৮)

বি:দ্রঃ হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) এর পূর্বে উল্লেখিত হাদীসে জুহরের পরে দু রাক'আতের কথা আছে আর এই হাদীসে চার রাক'আতের কথা আছে। যার মধ্যে দু'রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং দু'রাক'আত নফল।

আসরের সুন্নাত :

ফরজের পূর্বে ৪ রাক'আত সুন্নাত (গাইরে মুআক্কাদা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

عن النبى ﷺ قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا ۔

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তার উপর আল্লাহ তা'আলা রহম করুন যে আসরের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করবে। (জামে তিরমিযী ১/৯৮)

মাগরিবের সুন্নাত :

ফরজ আদায়ের পর ২ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং ২ রাক'আত নফল।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত,

قال من ركع بعد المغرب اربع ركعات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة

"তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিব নামাযের পর চার রাক'আত নামায আদায় করবে সে একের পর এক যুদ্ধকারীর মত হবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/৪১৫ হাদীস নং ৪৭৪০)

২. হযরত আবু মা'মার আব্দুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত –

قال كانوا يستحبون اربع ركعات بعد المغرب

"তিনি বলেন, হযরত সাহাবায়ে কেরাম মাগরিবের পর চার রাক'আত নামায আদায় করাকে মুস্তাহাব মনে করতেন। (মুখতাসারু কিয়ামিল্লাইল লিল মারওয়াযী ৮৫)

ইশার সুন্নাত :

ফরজের পূর্বে ৪ রাক'আত গাইরে মুআক্কাদাহ এবং পরে ২ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা অতঃপর ৩ রাক'আত বিতির ও ২ রাক'আত নফল ।

১. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كانوا يستحبون اربع ركعات قبل العشاء الاٰخرة

"সাহাবায়ে কেরাম ইশার নামাযের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করাকে পছন্দ করতেন।" (মুখতাসারু কিয়ামিল্লাইল লিল মারওয়াযী ৮৫)

২. হযরত যুরারাহ ইবনে আওফা (রহ.) হতে বর্ণিত, একদা হযরত আয়েশা (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন–

يصلى صلوة العشاء فى جماعة ثم يرجع الى اهله فيركع اربع ركعات ثم

তিনি বলেন–

بينما نحن فى المسجد مع رسول الله ﷺ اذ جاء اعرابى فقام يبول فى المسجد فقال اصحاب رسول الله ﷺ مه مه قال قال رسول الله ﷺ لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله ﷺ دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر انما هى لذكر الله والصلوة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله ﷺ قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه۔

"আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিলাম, ইত্যবসরে জনৈক বেদুইন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করতে লাগল, সাহাবায়ে কেরাম তাকে রাগতস্বরে বলতে লাগলেন থাম, থাম। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তাকে বাধা দিয়ো না, করতে দাও। সাহাবায়ে কেরাম তাকে প্রশ্রাব করা শেষ হওয়া পর্যন্ত আর বারণ করলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, এসকল মসজিদ প্রশ্রাব পায়খানার জন্য নয়, এগুলো তো আল্লাহর যিকির, নামায আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াতের স্থান। (বর্ণনাকারী বলেন) অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এধরনের শব্দ বললেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, এর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, তিনি এক বালতি পানি নিয়ে এলেন এবং পেশাবের স্থানে ছিঁটিয়ে দিলেন। (সহীহে মুসলিম ১/১৩৮)

দুই. কাপড় ও শরীর পাক হওয়া :

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وثيابك فطهر

তারপর বসে বসে দুই রাক'আত আদায় করতেন। (সহীহে মুসলিম ১/২৫৪, সহীহে বুখারী ১/১৫৫)

৫। হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان النبى ﷺ كان يصلى بعد الوتر ركعتين

"নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিতির নামাযের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। (জামেয়ে তিরমিযী ১/১০৮, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৮৩)

নামাযের অধ্যায় :

নামায সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ :

এক. জায়গা পাক হওয়া–

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود

"এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের, কিয়াম কারীদের, রুকু কারীদের এবং সিজদা দানকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখ।" (২২/২৬)

২। হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত–

ان النبى ﷺ نهى ان يصلى فى سبعة مواطن فى المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفى الحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله۔

" নবী করীম (সাল্লাল্লুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৭ স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন; ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থান, জন্তু জবেহের স্থান, কবরস্থান, মানুষ চলাচলের রাস্তায়, হাম্মাম তথা গোসলখানায়, উঁট বাঁধার স্থান (আস্তাবল) এবং বাইতুল্লাহর ছাদে। (জামেয়ে তিরমিযী ১/৮১)

৩। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, يأوى الى فراشه

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে ঘরে তাশরীফ আনতেন এবং চার রাক'আত নামায আদায় করে শুয়ে পড়তেন। (সুনানে আবী দাউদ ১/১৯৭)

৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ان النبى ﷺ كان يوتر بثلاث يقرء فى اول ركعة بسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية قل يا ايها الكفرون وفى الثالثة قل هو الله احد والمعوذتين۔

"নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিতির নামায তিন রাক'আত আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে سبح اسم ربك الاعلى পাঠ করতেন, দ্বিতীয় রাক'আতে قل يا ايها الكفرون এবং তৃতীয় রাক'আতে هو الله احد এবং মু'আব্বাজাতাইন' তথা সূরায়ে 'ফালাক' ও 'নাস' পাঠ করতেন। (তাহাবী শরীফ ১/২০০, সহীহে ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২৪৪৮, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/৪০৪ হাদীস নং ১২৫৭)

৪। হযরত আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

سألت عائشة رض عن صلوة رسول الله ﷺ فقالت كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس

"আমি হযরত আয়েশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মোট ১৩ রাক'আত নামায আদায় করতেন। প্রথমে ৮ রাক'আত (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন, এর পর বিতির পড়তেন,

"এবং নিজের কাপড় পাক রাখ।" (৭৪/৪)

২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قالت فاطمة بنت ابى حبيش لرسول الله ﷺ يا رسول الله انى لا اطهر أأدع الصلوة فقال رسول الله ﷺ انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاتركى الصلوة فاذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى۔

"ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো পাকই হইনা, আমি কি নামায পড়া ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এগুলো হায়েজ বা ঋতুশ্রাব নয় বরং রগ থেকে নির্গত রক্ত। তাই যখন হায়েজের দিন আসে তখন নামায আদায় করো না, আর যখন নিজের হিসাব মতে হায়েজের দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেল এবং নামায আদায় কর। (সহীহে বুখারী ১/৪৪)

৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

بينما رسول الله ﷺ يصلى باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله ﷺ ان جبريل عليه السلام اتانى فاخبرنى ان فيهما قذرا۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে নামায পড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি নিজের জুতাদ্বয় খুলে বাম দিকে রেখে দিলেন, সহাবায়েকেরাম তা দেখে নিজেদের জুতাগুলোও খুলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায শেষে সাহাবায়েকেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু তোমাদের জুতো খুলতে উৎসাহ যোগিয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আপনাকে জুতো খুলতে দেখেছি তাই আমরাও জুতা খুলে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, আমাকে জিবরাঈল (আ.) এসে খবর দিয়েছেন যে, আমার জুতোই নাপাকি (লেগে) আছে।

তিন. সতর ঢাঁকা :

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يبنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

"হে আদম সন্তান নিজের সৌন্দর্যকে প্রত্যেক নামাযে ধরে রাখো।" (৭/৩১)

২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال رسول الله ﷺ لا تقبل صلوة الحائض الا بخمار

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মাথা আচ্ছাদিত করা ছাড়া যুবতী নারীর নামায কবুল হবে না।" (জামেয়ে তিরমিযী ১/১৮৬, সুনানে আবু দাউদ ১/৯৪)

৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাতাদা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন–

لايقبل الله من امرأة صلاة حتى تورى زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر

"আল্লাহ তা'আলা কোনো মহিলার নামায ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন না, যতক্ষণ সে নিজের সৌন্দর্য ঢেকে না রাখে এবং কোনো বালেগ মেয়ের নামায কবুল করেন না, যতক্ষণ সে উড়না পরিধান না করে অর্থাৎ মাথা আবৃত না করে। (তাবারানী, আল মু'জামুল আওসাত ১/১২২)

নামাযরত অবস্থায় বরং সর্বাবস্থায় পুরুষের জন্য টুপি পরিধান করা সুন্নাত :

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ يكثر القناع

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় সময় মাথা মোবারক ঢেকে রাখতেন। (শমায়েলে তিরমিযী ৭১)

(টুপি সম্পর্কে মাসিক আল-আবরার সেপ্টেম্বর ২০১২ইং সনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাযের কাতার সোজা করা সুন্নাত :

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان رسول الله ﷺ قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدى اخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطن ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা কাতার সুজা করো, কাঁধসমূহকে বরাবর করো, খালী স্থান পূর্ণ করো, নিজের ভাইয়ের হাতের সাথে নম্র ব্যবহার কর, শয়তানের জন্য জায়গা খালি রেখো না, যে কাতার যুক্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আপন রহমতের সাথে যুক্ত রাখবেন এবং যে কাতার বিচ্ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলাও তাকে রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। (সুনানে আবী দাউদ ১/৯৭, মিশকাত ১/৯৯)

২। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)

সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ يتخلل الصف من ناحية الى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الاول۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের কাতারে প্রবেশ করতেন এবং এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আমাদের সীনা এবং কাঁধসমূহকে সমান করতেন এবং বলতেন, তোমরা অগ্রপশ্চাত হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরে অনৈক্য সৃষ্টি হবে এবং বলতেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম কাতারের লোকদের জন্য রহমত প্রেরণ করেন এবং ফেরেশতাগণ রহমতের দু'আ করেন। (আবু দাউদ ১/৯৭)

৩। হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال اقيمت الصلوة فاقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فانى اراكم من وراء ظهرى۔

"নামাযের ইকামত বলা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, দেখ তোমরা কাতার সোজা রাখ, মিলে মিলে দাঁড়াও, কারণ আমি তোমাদেরকে পেছন থেকে দেখি। (সহীহে বুখারী ১/১০০)

নামাযের নিয়ম

নিয়ত করা:

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الخ

"তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তারই জন্য খালেস রেখে।" (সূরা বায়্যিনাহ ৫)

২। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

انما الاعمال بالنيات

"আমলের ভিত্তি নিয়তের উপর।" (মুসনাদে আবীহানীফা-হারেছী-১/২৫০, সহীহে বুখারী ১/২)

কেবলা মুখী হওয়া

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره

"তোমরা যেখানেই থাক এর দিকে চেহারা ফেরাও।"(সূরা বাক্বারা ১৪৪)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال رسول الله ﷺ اذا قمت الى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন তুমি নামাযের ইচ্ছা করবে তখন তুমি ভাল করে ওজু কর, এর পর কেবলামুখী হও। (সহীহে বুখারী ২/২৮৬, সহীহে মুসলিম ১/১৭০)

কিবলা মুখী হওয়ার সময় চেহারা কেবলার দিকে থাকা :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

بينما الناس بقباء فى صلوة الصبح اذ جاء هم آت فقال ان رسول الله ﷺ قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة۔

"লোকেরা (সাহাবায়ে কেরাম) মসজিদে ক্বোবায় নামায আদায় করছিলেন, ইত্যবসরে জনৈক আগন্তুক এসে বললেন, আজ রাতে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তাঁকে হুকুম দেওয়া হয়েছে কা'বামুখী হওয়ার, অতএব তোমরাও কাবামুখী হয়ে যাও। তখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাস মুখী ছিলেন, অতঃপর তাঁরা (নামাযেই) কা'বা মুখী হয়ে গেলেন। (সহীহে বুখারী ১/৫৮, সহীহে মুসলিম ১/২০০)

তাকবীর বলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেন–

ثم استقبل القبلة فكبر

"অতঃপর কেবলামুখী হও এবং তাকবীর বল।" (সহীহে বুখারী ২/৯৮৬, সহীহে মুসলিম ১/১৭০)

দাঁড়ানো :

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وقوموا لله قانتين

"আল্লাহর সামনে খুশুখুযু (বিনয় ও নম্র) হয়ে দাঁড়াও।" (সূরা বাক্বারা ২৩৮)

২। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

فسألت رسول الله ﷺ عن الصلوة فقال صل قائما

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়।" (সহীহে বুখারী ১/১৫০, সুনানে আবু দাউদ ১/১৪৪)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

উদীয়মান কাফেলা

ছয় দশক পর পরিবর্তন হল আল্লাহর পবিত্র ঘরের তালা

আল্লাহর পবিত্র ঘর মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ ইবাদতের স্থান কা'বা শরীফের প্রধান দরজার ভিতরের তালা ৬০ বছর পর প্রথমবার পরিবর্তন করা হল। গত জুমাবার (৩০ নভেম্বর ২০১২ইং) কা'বা শরীফ ধৌত করার সময় মক্কা মুকাররমার গভর্ণর শাহজাদা খালেদ আল-ফয়সালের হাতে তালা পরিবর্তনের এই মহৎ পুণ্যময় কাজ সম্পাদিত হয়। সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ সংবাদসংস্থা আল-আরবিয়্যাহ ডট নেট এর রিপোর্ট অনুযায়ী, কা'বা শরীফের পবিত্র তালা ৬ দশক পর প্রথমবার পরিবর্তন করা হল। তালা পরিবর্তনের পূর্বে মক্কা-মুকাররমার গভর্ণর শাহজাদা আল-ফয়সাল কা'বা শরীফ ধৌত করেন। এরপর তালা পরিবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং পূর্বে যে তালা ছিল সেটি বের করে সেস্থানে আরেকটি নতুন নির্ভেজাল স্বর্ণ দিয়ে তৈরীকৃত তালা রাখা হয়। খাদেমুল হারামাইনিশ শরীফাইন শাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজীজ সম্পূর্ণ নজস্ব খরচে কা'বা শরীফের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছেন এই তালা। রিপোর্ট অনুযায়ী, কা'বা শরীফ ধৌত করার সময় মসজিদে হারাম তদারক কমিটির চেয়ারম্যান, খতীব ও ইমাম শায়খ আব্দুর রহমান সুদাইছ, মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রদূতগণ এবং প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা আল্লাহর ঘর ধৌত করার পুণ্যময় কাজে অংশগ্রহণের বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেন।

উল্লেখ্য, কা'বা শরীফকে প্রতিবছর দু'বার সুগন্ধি এবং যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হয় এবং প্রতিবছর একবার করে তার গেলাফ (আবরণ, আচ্ছাদন) পরিবর্তন করা হয়।

কা'বা শরীফের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ড. ইউসুফ আল-ওয়াহিল আল-আরাবিয়্যাহ ডট নেট এর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় বলেন, আল্লাহর ঘরকে প্রতিবছর দু'বার ধৌত করা হয়। প্রথমবার ধৌত করা হয় হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১৫ তারিখে। দ্বিতীয়বার ধৌত করা হয় শা'বানের ১ম তারিখে। ওই সময় ধৌত করা হয় যখন বায়তুল্লাহর জিয়ারতকারী, তাওয়াফকারী এবং ওমরাহ পালনকারীদের খুব একটা ভীড় থাকেনা। এবং গোসলের জন্য এটাকেই উপযুক্ত সময় বলে মনে করা হয়। আবার কা'বা শরীফের গেলাফ ৯ জিলহজ্জ পরিবর্তন করা হয়।

আল-আরাবিয়্যাহর মতে, কা'বা শরীফের মত কা'বার সাথে যত জিনিষ সম্পৃক্ততা রাখে সেগুলোও মুসলমানদের কাছে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার মধ্যে কা'বার চাবিও রয়েছে। কা'বা শরীফের চাবি সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর ধরে পবিত্র মক্কার প্রসিদ্ধ গোত্র আলে শায়বার কাছে আমানত হিসাবে রাখা ছিল। ইসলামী ইতিহাসের প্রাচীনগ্রন্থসমূহে শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কোন এক যুগে পবিত্র কা'বার চাবি আলে শায়বা গোত্র থেকে চুরি হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে আবার তারা ওই চাবি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

এই পবিত্র আমানত বর্তমানে আলে শায়বার আস-সুদনাহ গোত্রের কাছে রয়েছে। রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই গোত্র ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই সম্মানের অধিকারী থাকবে। (অর্থাৎ- চাবি তাদের কাছে থাকবে।)

হাদীস শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে, মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা শরীফে প্রবেশ করার জন্য আলে শায়বা গোত্রের কাছে চাবি চাইলেন। যেহেতু সে সময় তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেনি সে জন্য সাহাবায়ে কেরাম তাদের থেকে জোরপূর্বক চাবি নিয়ে নেয়। তালা খোলার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাবি কোন সাহাবীকে দিয়ে দিলেন। আলে শায়বা তাদের শত বছরের পুরনো ঐতিহ্য হারিয়ে খুবই মর্মাহত হল। তখনি আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে" (নিসা ৫৮)।

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উছমান বিন তালহা (রা.) এর দাদাকে কা'বা শরীফের চাবি দিয়ে বললেন, হে তালহার বংশধরগণ, এই চাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমানত স্বরূপ। এটি তোমাদের কাছে সংরক্ষণ করে রাখ। এই আমানত সর্বদা তোমাদের কাছে থাকবে। তোমাদের থেকে এই আমানত যে ছিনিয়ে নিবে সে হবে অত্যাচারী (বুখারী খ:২ হাদীস নং ৪১২৩)। তারা যখন এব্যাপারে প্রশ্ন করল তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমাদের আমানত তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তারা বলল, আপনার প্রভু এতই দয়ালু! আমি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, এই বলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

রিপোর্ট মতে, আলে শায়বা গোত্রের বর্তমান অধিপতি আব্দুল কাদের আশ-শায়বী কা'বা শরীফের চাবির

সংরক্ষনের ব্যাপারে বলেন যে, কা'বার পবিত্র চাবি কা'বা শরীফের গেলাফ দিয়ে তৈরী একটি স্বর্ণের থলিতে খুব যত্নসহকারে সংরক্ষিত গোপন স্থানে রাখা হয়েছে। যেখান থেকে সেটা হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

ইসলামী ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আব্বাসীয় ও ওসমানীয় শাসনামলে মুসলমান রাজা-বাদশাহরা কা'বা শরীফের চাবি একজন আরেকজনকে মৃত্যুর পূর্বে সোপর্দ করে যেত। তা সত্ত্বেও তার মূল মালিকানা আলে শায়বা গোত্রের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কা'বা শরীফের দরজা, দেওয়ালের মত তালা-চাবির উপরও খুব সুন্দর আরবী হস্তলিপিতে কুরআনের আয়াত কারুকার্য করা হয়। কা'বা শরীফ প্রশস্তকরণের সময় কা'বা শরীফের দরজার সংখ্যা ও বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রত্যেক দরজার জন্য তালা-চাবিও তৈরী করা হয়। তৎকালীন তালাগুলো লোহা দ্বারা তৈরী করা হত। কা'বা শরীফের শেষ দরজার তালা ও তার চাবি ওসমানি খেলাফতের ১৩০৯ হিজরীতে তৈরী করা হয়। ১৩৯৮ হিজরীতে কা'বা শরীফের প্রধান দরজার তালা বাদশাহ খালেদ বিন আব্দুল আজীজের আদেশে পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে কা'বা শরীফ ধৌত করার পর সে তালার স্থানে একটি নতুন উজ্জ্বল তালা লাগানো হয়েছে, যা তৈরী করা হয়েছে খাঁটি সোনা দ্বারা।

প্রসঙ্গত, ধনাঢ্য মুসলমানরা পূর্ব থেকেই পবিত্র কা'বার পুরনো তালা-চাবি খুব চড়া মূল্যে কিনে নিত এবং সেগুলোকে পবিত্র বস্তু হিসেবে নিজেদের বাড়ী-ঘরে বরকতের জন্য রাখত। কিছুদিন পূর্বেও কা'বা শরীফের একটি পুরানো তালা-চাবির সাধারণ নিলাম ডাকা হয়। যেটা প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলার থেকে বেশী মূল্যে বিক্রি হয়। ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র জিনিস সমূহের মূল্যের ক্ষেত্রে এটাকেই সবচেয়ে চড়ামূল্য বলে বিবেচনা করা হয়।

রিপোর্ট মতে, কা'বা শরীফের মোট ৫৮ টি তালা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ৫৪টি চাবি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অবস্থিত "তোফ কাফি" নামক বিখ্যাত মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। ২টি চাবি ফ্রান্সের "নেহাদুস সা'য়ীদ" জাদুঘরে এবং ১টি চাবি মিসরের রাজধানী কায়রোর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে যে তালা-চাবি খুলে নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্তের কথা কর্তৃপক্ষ জানায়নি।

অবলম্বনে : রোজনামা উম্মত, রবিবার ০২ ডিসেম্বর ২০১২ ইং

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদের উখিয়াভী

তারানা

আল-আবরার

আবিদ আল আহসান

চেয়ে দেখো ঐ মেঘ বুক চিরে তার উদিত হয়েছে রবি
তার আলোতেই আলোকিত আজ এই ভূবনের সবি
আঁধারকে সে করেছে আলোকিত
সকলে আজ তাতে পুলকিত
তার পরশে কলম শানায়ে আজিকে অনেকে হচ্ছে কবি
তার আলোতেই আলোকিত আজ এই ভূবনের সবি
পথ হারা দিকভ্রান্ত যত পথিক সে দেখায় তাদের সঠিক পথ
তার ছোঁয়াতে জাতি সুফল এই কথা যেন সবার মত
মুসলিম নর-নারী এই ভবে
ধীরে ধীরে তা কাছে নেবে
শিয়রে তাকে টেনে নিলে সকলে আবার ফিরে পাবে হিম্মৎ
তার আলোতেই আলোকিত আজ এই ভবে অন্ধাকর সকল পথ
বহু মনকে সে করেছে আপন সেই যেন আজ শত হৃদয়ের আশা
তা যেন আজ সবার মুখের চির চেনা সেই মিষ্টি মধুর ভাষা
কে সে জন এমন তার কারবার?
নামটি তার মাসিক আল-আবরার
সেই যেন আজ সব হৃদয়ের উজাড় করা শ্রেষ্ঠ ভালবাসা
তার আলোতেই দুঃখ ভুলে আজিকে সবার হাসা
সালাম তোমায় হাজার সালাম, হে আবরার থাকো চির সুখে
সারাটি জীবন এমন করে ফোটাও হাসি সর্বস্তরের মুখে
জানাই তোমায় মোবারকবাদ
ছিন্ন করে আধার ধারা কর হে আবাদ
সবসময়ের প্রিয় তুমি আমার সুখে দুখে
দাও তুমি আজ ভ্রান্তি সকল এক নিমিষেই রুখে।

বসুন্ধরা মারকায

নুরুল আবছার টেকনাফী

ইসলামী সেন্টার নাম তোমার, অবস্থান তোমার বসুন্ধরায়
কুরআন হাদীস শিক্ষাদানে-ই, থাক তুমি ব্যস্ততায়।
আল্লাহ ওয়ালা মানুষ তৈরী, এটাই তোমার ধর্ম
নবীর সুন্নাত করতে ক্বায়েম, নিষ্ঠাই তোমার কর্ম।
ইফতা, হাদীস, তাফসীর বিভাগ, তাজবীদ আরো যত,
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার, ছাত্র আসে কত।
হাফেজখানায় দিনরজনী, কুরআন শিক্ষা পায়,
লা-ইলাহার যিকির নিয়ে, ভোরের আলো জাগায়।

খবরাখবর

চট্টগ্রাম "আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন"এর ইন্তেজামিয়া অধিবেশনে মুফ্তী আমিনীর জন্য বিশেষ দোয়া

চট্টগ্রাম থেকে- মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মাসরূর

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ এর তত্বাবধানে আগামী ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী তিনদিন ব্যাপী চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য ২৮তম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন এর সার্বিক ইন্তেজাম উপলক্ষে এক অধিবেশন গত ১৫ ডিসেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায় সংস্থার প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রাম শহরস্ত দামপাড়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয় ।

সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল ফক্বিহুল মিল্লাত শাহ্ মুফ্তী আব্দুররহমান সাহেব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সংস্থার অতীত কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনাসহ দিক-নির্দেশনা মূলক বক্তব্য পেশ করেন সংস্থার সহসভাপতি জামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক হযরত আল্লামা মুফ্তী আব্দুল হালীম বোখারী সাহেব, সহসভাপতি দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা সুলতান যওক নদভী সাহেব, আব্দুল্লাহ আল মাসরুর ফরিদপুরী, হাজী এনামুলহক, হাজী মেহেদী সাহেব, মাও: জয়নুল আবেদীন, হাজী আবু হানিফ প্রমূখ । অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা লোকমান হাকীম মুহতামিম মোজাহেরুল উলুম মাদ্রাসা, মুফ্তী এনামুলহক কাসেমী, মাও: রুহুল আমিন হায়দার, মুফ্তী শামসুদ্দিন জিয়া, মাও: আমিনুলহক, মাও: কলিমুল্লাহ, মাও: মুছা, মুফ্তী আব্দুলকাদের, মাও: আমানুল্লাহ, মাও: আব্দুলআজিজ, হাজ্বী ইসহাক, মাও: আব্দুলজলীল, মাও: শামসুলআলম, মাও: জাকেরুল্লাহ নিয়াজী, মাও: আব্দুররহমান, মাও: এমরান, মাও: আনোয়ার, মুফ্তী ওসমান, মাও: তৈয়ব, মাও: আবুতাহের নদভী, মাও: মুহাম্মদ তাহের, মাও: এনায়েতুল্লাহ, মাও: আবুতাহের আরবী, মাও: মুফ্তী ইউসুফ, মাও: আব্দুলমতিন বোখারী, মাও: আব্দুররহিম, মাও: লোকমান, মাও: নুরুলহক, মাও: শামসুলহুদা, মাও: আক্তার, মাও: হাবিবুল্লাহ, মাও: মোহাম্মদ হোছাইন, হাফেজ মাও: আবুবকর, মো: আবুইউছুফ, আব্দুল মুমিন, আব্দুল মতিন, মাও: ইউসুফ, মুফ্তী আব্দুল কাদের, মাও: আব্দুর রহমান, মাও: নাজিমুদ্দীন, মাও: গিয়াসউদ্দীন, হাফেজ মিজান, ইঞ্জিনিয়ার মিরাজ, মো: ইলিয়াছ, মাও: এনায়েতুল্লাহ, মাও: হারুন, মাও: অলিউল্লাহ, মাও: জামালুদ্দীনসহ চট্টগ্রামের সকল কওমী মাদ্রাসার মুহতামিম ও সংস্থার সদস্যগণ এবং কক্সবাজার জেলার প্রতিনিধি মাও: এবাদুল্লাহ, মাও: মুসলিম, মাও: হোসাইন, মাও: আবুল কাসেম, মাও: আনোয়ার প্রমূখ ।

তিন শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংস্থার সহসভাপতি জামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক বলেন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তত্বাবধানে আগামী ৬,৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ইং চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন মহান আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন । যার প্রমাণ, এটা ২৮বছর যাবৎ একইভাবে- রাসুল (সা:) এর রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের উপর অটল অবিচল থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । সমগ্র দেশের প্রায় সকল এলাকায় এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে । আল্লামা সুলতান যওক নদভী বলেন এ সম্মেলন এর মাধ্যমেই মানুষ হক্ব বাতিলের পার্থক্য বুঝেছেন, এটা আমাদের মুরব্বীদের রেখে যাওয়া আমানত, তিনি মুফ্তী মরহুম ফজলুলহক আমিনীর স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বলেন, ইসলামী জগতের সাহসী মহাপুরুষ চলে গেছেন । এভাবে সকলে চলে যাবেন তিনি মুফতী আমিনীর জন্য সকলের প্রতি দোয়ার আবেদন করেন । সভাপতির ভাষণে ফক্বিহুল মিল্লাত শাহ্ মুফ্তী আব্দুররহমান সাহেব বলেন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তত্বাবধানে আগামী ৬,৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ও দেশের বড় বড় শহরে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনসমূহ দেশ ও জাতির জন্য হক্ব ও হক্কানীয়তের নমুনা । এখানে সুন্নত মুতাবেক সম্মেলন চলে, তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মেলনে অংশ গ্রহণের আহবান জানান এবং সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের উপজেলাগুলোতে সফরের তারিখ ঘোষণা করেন । তিনি বলেন এটি শজ্রায়ে ত্বইয়্যেবার মত তার শাখা-প্রশাখা সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছে । তিনি মাসব্যাপী দেশের বড় বড় জেলাশহরসমূহে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলন এর তারিখসমূহ ঘোষণা করেন ।

২০১৩ইং এর মাসব্যাপী দেশের বড় বড় জেলা শহরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তত্বাবধানে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনসমূহ আগামী ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার ফেনী, ২৭জানুয়ারী রবিবার পাবনা, ২৮জানুয়ারী সোমবার সিরাজগঞ্জ, ২৯জানুয়ারী মঙ্গলবার দিনাজপুর, ৩০জানুয়ারী বুধবার রংপুর, ১লা ফেব্রুয়ারী হোমনা-কুমিল্লা, ২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার ঢাকা জামিয়াতুল আবরার, ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারী রবি ও সোমবার সিলেট, ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম, ১০ফেব্রুয়ারী রবিবার বি-বাড়িয়া, ১১ফেব্রুয়ারী সোমবার ঢাকা লালবাগ, ১২ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ফরিদপুর, ১৩, ১৪ফেব্রুয়ারী বুধ ও বৃহস্পতিবার কক্সবাজার, ১৫,

১৬ফেব্রুয়ারী শুক্র ও শনিবার নোয়াখালী অনুষ্ঠিত হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

পরিশেষে মুফ্‌তী ফজলুল হক আমিনীর ইন্তেকালে সমবেদনা প্রকাশ ও বিশেষ দোয়া, দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ মুনাজাতের মাধ্যমে অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করেন। মুনাজাত পরিচালনা করেন জামিয়া দারুল মা'আরিফ এর মহাপরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী।

জামিয়া মাদানিয়ার বার্ষিক সভায় বক্তাগণ

যুগের এই ক্রান্তিলগ্নে মুসলমানদের একমাত্র অবলম্বন সুন্নাহর অনুসরণ

জামিয়া মাদানিয়া থেকে মাওঃ ওয়ালীউল্লাহ

ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জামিয়া মাদানিয়া চট্টগ্রাম, শুলকবহর মাদ্রাসার ২দিনব্যাপী বার্ষিক সভায় সভাপতির বক্তব্যে সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম) বলেন যুগের এই দুঃসময়ে মুসলমানদের একমাত্র অবলম্বন হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক আনীত সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও বেশী বেশী করে আল্লাহর নিকট দু'আ করা। দু'আ হলো মুমিনের প্রধান হাতিয়ার। দু'আ-এর মাধ্যমে আমাদের জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। অবশ্যই দু'আকারীকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশিত পন্থায় দু'আ করতে হবে।

যুগের এই ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে, এর বিকল্প আর কোনো এমন মাধ্যম নেই যা যুগের এই ক্রান্তিলগ্নে বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এদেশে সঠিক ইসলামী শিক্ষার একমাত্র ধারকবাহক কওমী মাদ্রাসাতেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুসরণে পুর্ণাঙ্গ দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য বিশ্বব্যাপী বিধর্মী অপশক্তিগুলো প্রতিনিয়ত তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে রাসূল (সা:) এর সুন্নাতের অপব্যাখ্যা ও নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিভিন্ন ধরণের কার্টুন-ভিডিও ইত্যাদি নির্মার্ণ করার কাজে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং সুন্নাত বিরোধী যত প্রোপাগান্ডা চলবে ততবেশী সুন্নাতের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান তিনি।

আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতি আব্দুল হালিম বোখারী সাহেব পবিত্র কুরআন মজিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "তোমরা নিজেদের ক্বলবকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবে, আমার কাছে আসার সময় পরিষ্কার ক্বলব নিয়ে আসতে হবে, না হয় ছেলে সন্তান ও ধন সম্পদ কোন কাজে আসবে না।" কিন্তু নফ্‌স ও শয়তান চায় মানুষের অন্তরে সদা কুফর, শিরিক, হাসদ, হিংসা, দুশমনি, বড়ত্ব, রিয়া ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত করতে। কিন্তু যে ক্বলব এই সব ময়লা মুক্ত ও পূত-পবিত্র হবে তা আরশের চেয়ে ও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। তাই ইবাদত করার পূর্বে আমাদের ক্বলবকে পরিষ্কার করতে হবে। ক্বলব পরিষ্কার রাখার উপায় হলো স্বীয় নফ্‌সকে দমন করে রাখা।

আল্লামা সুলতান যওক্ব নদভী সাহেব বলেন- সঠিক নির্ভূল ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার প্রসারে বিশ্বব্যাপী কওমী তথা দেওবন্দী শিক্ষা ও শিক্ষানীতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আজ একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রচার ঘটলেই সঠিক দ্বীন মানুষের কাছে পৌঁছবে। মুসলিম সমাজ সঠিক দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকলে বিশ্ব জুড়ে অশান্তি নামের কিছুই থাকবে না। আর সঠিক দ্বীনের উপর অটল থাকার একমাত্র উপায় হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা:) এর সুন্নাতের অনুসরণ করা।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করেন হযরত মাওলানা এমদাদুল্লাহ নানুপুরী, আল্লামা জুনাইদ আল-হাবীব ঢাকা, আল্লামা জুবাইর আহমদ আনসারী, বি বাড়িয়া, আল্লামা খুরশিদ আলম কাসেমী, আল্লামা আব্দুলবাসেত সিরাজী, হযরত মাওলানা আব্দুসসালাম, জিরি মাদ্রাসা প্রমুখ।

পবিত্র হারাম শরীফের ইমাম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সুবাইলের ইন্তিকাল

পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফের প্রবীণ ইমাম ও খতীব এবং পবিত্র হারমাইন শরীফাইন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সুবাইল গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ইং ইন্তিকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। গোটা মুসলিম উম্মাহর খুবই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। বাইতুল্লাহ শরীফের ইমাম ও খতীব হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সফর করে ছিলেন। জামিয়া পটিয়ার তৎকালীন মহাপরিচালক হযরত মাওলানা আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) ও হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দামাতবারাকাতুহুম এর একান্ত প্রচেষ্টায় তিনি জামিয়া পটিয়ায় আগমন করেন।

তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, বাংলাদেশের আলেম উলামাদের প্রতি মরহুম খতীবের অগাধ ভালবাসা ছিল। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156
ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent
হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।
Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়
জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান
প্রস্তুতকারক
হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩